রাত
ও
প্রভাত
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশ করেছেন —
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

রথযাত্রা
১৩৬৯

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন —
শ্রীবলাইবন্ধু রায়

ব্লক করেছেন —
রয়াল হাফটোন কোম্পানি

এস. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

রাত্রে ও প্রভাতে

বি-এ পাস করবার পর আমার মনের এমন একটা অবস্থা হল যা শুনলে আপনারা হয়ত হাসবেন। তবু বলি : সব ছাত্রেরই মনের অবস্থা ঠিক এইরকম হয় কিনা জানি না। আমার কিন্তু হয়েছিল। যে দুর্জ্ঞেয় নারীচরিত্র—যার অন্তরের কথা [illegible] সন্ধান [illegible] প্রকাশ করে গেছেন, [illegible] নারীচরিত্র [illegible] যেন আমার জানা।

দাদা-বৌদির অত্যধিক আদর পেয়ে পেয়ে আমি হয়ে উঠেছিলাম একটি আদুরে গোপাল। মা ছিলেন শুনেছি, কবে মারা গেছেন মনেও নেই।

বৌদির মুখে শুনেছিলাম, মা মারা গেছেন যখন আমার মাত্র দেড় বছর বয়স। বৌদি তখন সবেমাত্র [illegible] হয়ে এসেছে আমাদের বাড়িতে। আমার দেখাশো[illegible] ভার পড়েছিল তারই হাতে। তখন তার বয়সই-বা ক[illegible]

তেরো-চৌদ্দর বেশী হবে না। দাদার বয়স তখন উনিশ
সবে বি-এ পাস করেছে।

আরও তিন বছর পরে আইন্ পাস করে দাদা য
সবে কোর্টে প্রাকটিস শুরু করেছে, তখন বাবা গে
মারা। সমস্ত সংসারের ভার এসে পড়লো দা
ঘাড়ে—

স্কুলে ছিলাম আমি খুব ভাল ছেলে। ম্যাট্রি
জলপানি পেয়েছিলাম। আর পেয়েছিলাম দাদা-বে
কাছ থেকে অজস্র প্রশংসা। এই প্রশংসা পেয়েই বো
আমার মাথাটা গিয়েছিল বিগড়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে ত
ধারণা হয়েছিল পৃথিবীর সব কিছুই বোঝবার ক্ষমতা ত
আছে। এক কথায় আমি হয়ে উঠেছিলাম—সবজা

যাক্ সে কথা, ফিরে যাই আমার নিজের কথায়

পড়ছি তখন এম-এ ক্লাসে—অর্থাৎ পড়বার নাম
রোজ কলেজে আসছি। আর দাদার পয়সায় ক
সংলগ্ন চায়ের দোকানে বসে বন্ধু-[illegible]

[illegible] অবশ্য যেতাম। কারণ, আমি জানত
পড়াশুনাটা দাদা বড় ভালবাসে। নিজে সে
পাস করতে পারেনি। তাই তার বড় সাধ ছি
যেন এম-এটা পাস করি। শুধু এম-এ কেন?
যতদিন ইচ্ছা এবং যা ইচ্ছা আমি যেন পড়ে যাই।

আমি বি-এ পাস করবার পর বৌদি একদি
কাছে গিয়েছিল আমার বিয়ের কথা বলতে
[illegible]কে এক ধমকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, তু

চ ? সমরের বয়স কত হলো ? এর মধ্যে তার বিে
ব ? তাছাড়া বিয়ে এখন দিলেই লেখাপড়া ছেড়ে ওবে
ষ্টা করতে হবে কাজের। পয়সার অভাবে আি
ম-এ পাস করতে পারিনি। রোজগারের চেষ্টা করে
য়েছে। ও কেন সে কষ্ট করবে ?

বৌদি ঢোঁক গিলে আমতা আমতা করে বলেছিল
রুষমানুষ রোজগার করা কি খারাপ ?

দাদা প্রতিবাদ করে বলেছিল, কেন ? আম
রাজগারে কি সংসার চলছে না ? কোন্‌টার অভাব দে
দয়েছে বল তো—মহারানী ?

এর পরে বৌদির বলবার আর কিছু ছিল না। বে
লে আসছিল ঘর থেকে বেরিয়ে। দাদা তাকে ডে
ললে, শোনো শর্মিষ্ঠা, আমাদের বিয়ে যখন হয়েছি
সেটা ছিল এক যুগ। আর এখন [illegible] এ
আর অন্যের পছন্দ-করা মেয়ে বিয়ে করতে চাচ্ছে
[illegible] আর [illegible] চাচ্ছে না অন্যের পছন্দ-
[illegible] বিয়ে করতে। সমর যদি নিজে পছন্দ ক
ভালবেসে কোনও মেয়েকে বিয়ে করতে চায় তো ক
না ! তুমি কেন এর ভেতর মাথা গলাতে যাচ্ছ ?

এই কথা শোনার পর আমি পরিষ্কার বুঝতে পে
ছিলাম দাদার মনোভাব। মন্দ কি ! দেখাই যাক্

প্রথমেই নজর পড়লো মালবিকার ওপর। ছোটখ
বেঁটে চেহারা, গায়ের রঙ ঠিক দুধে-আলতা না হ
ফরসা বলা চলে। রোজ কলেজে আসতো।

রাতে ও প্রভাতে

মালবিকার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় চায়ের দোকানে।

সকাল সাতটা থেকে সেদিন আমরা সকলেই লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করছিলাম। আমরা তখন থাকি শ্যামবাজারের কাছে একটা ভাড়াটে বাড়িতে। দাদা সল্টলেকে বিরাট জমি কিনেছে। বাড়ি তৈরি হবে। সিমেণ্ট, লোহা ঠিকমত পাওয়া যাচ্ছে না বলেই বাড়ির কাজ এগোচ্ছে না। সামান্য সামান্য করেই হচ্ছে। সাড়ে ন'টার সময় লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে পড়লাম স্নান-খাওয়া সেরে আসতে।

ফিরে এলাম প্রায় সওয়া এগারটায়। তখনও দেখি মালবিকা নিশ্চিন্তে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে। মনে মনে কৌতূহল হল—ও বাড়ি যাবে না? খাওয়া-দাওয়া করবে না?

আমার ভাবনা হলেই বা কি? সে কথা তো মুখফুটে জিজ্ঞাসা করা যায় না? কি করি, তাই একখানা বই নিয়ে পড়ায় মন বসাতে চেষ্টা করলাম।

প্রায় সাড়ে বারোটার সময় দেখি মালবিকা বই রেখে ওঠবার চেষ্টা করছে। এক কাপ চা খাবার আমিও প্রয়োজন বোধ করলাম। তাই আমিও উঠে পড়লাম। দুজনেই নেমে এলাম আশুতোষ বিল্ডিং-এর সিঁড়ি ধরে। বেরিয়ে লনে পড়লাম।

মালবিকা সোজা গেট দিয়ে বার না হয়ে বাঁদিকে বেকার লেবরেটারির কাছে যে রেস্টুরেণ্টটা আছে, সেই

দিকে এগিয়ে গেল। আমিও গেলাম তার পিছু পিছু। সেখানে সে ঢুকে একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসলো। তার ওপর দৃষ্টি রাখা যায় এমন একটা জায়গা দেখে আমিও বসে পড়লাম।

মালবিকা দিলে খাবারের অর্ডার, আর আমি দিলাম চায়ের অর্ডার।

হঠাৎ দেখি মালবিকা কি খোঁজাখুঁজি করছে। তার পরমুহূর্তেই সে চায়ের দোকানের মালিককে উদ্দেশ করে বললে—দেখুন, খাবার আর দিতে হবে না। কথাটা শেষ করেই সে যেন লজ্জা এড়াবার জন্যই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল দোকান থেকে। আমি তো অবাক্! কি ব্যাপার! না খেয়ে অমন করে ও চলে গেল কেন?

হোটেল তখন ছাত্র-ছাত্রীতে ভরতি। কেউ এসেছে ক্লাস পালিয়ে, কেউ-বা এসেছে চা খেতে আবার কেউ-বা এসেছে সময় কাটাতে। তারা এক কাপ করে চায়ের অর্ডার দিচ্ছে আর সেটাকে খুব কম্‌সে-কম তিন কোয়ার্টারের ওপর সময় লাগাচ্ছে খেতে, আর সঙ্গে সঙ্গে পড়ছে তাদের সিগারেটে টান। তাও নগদ পয়সায় নয়। হোটেলের মালিকের সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকেই চলছে ধারে।

এ নিত্যকার ব্যাপার। নূতনত্ব কিছু নেই। নূতনত্ব ঘটালো মালবিকাই এইমাত্র হোটেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে।

নানারকম চিন্তা আমার মাথার মধ্যে খেলে গেল! খাবারের অর্ডার দিয়েও ও খেলে না কেন? চেয়ারে বসে

খুঁজছিলই বা কি ? কিছু ফেলে আসেনি তো ? যাবার সময় অমনভাবেই বা গেল কেন ? যেন ছুটে পালিয়ে গেল ? নাঃ—ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে। এই ভেবে আমি বেরিয়ে পড়লাম দোকান থেকে। এগিয়ে গেলাম ওর পিছু পিছু। ও তখন পাশের গেটটা পার হয়ে সোজা এগিয়ে চলেছে ট্রামরাস্তার দিকে।

প্রায় ট্রামরাস্তার মুখে গিয়ে ধরলাম ওকে !

কি জিজ্ঞাসা করি এখন ? একটা দারুণ লজ্জা এসে আমাকে পেয়ে বসলো। গলা অবধি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল—মুখে কথা বেরুলো না। তবু ওর চোখে চোখ রাখবার চেষ্টা করলাম। ও চোখটা ফিরিয়ে নিলে। আমি তার চোখের ভাষা পড়তে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমাকে দেখে ও যেন একবার থমকে থামলো, তারপর সেখান থেকে চলে যাবার জন্যে তৈরী হল। এ সুযোগ হারালে চলবে না। তাই খুব সাহস করে এগিয়ে গেলাম। কোন রকমে বললাম, একটু দাঁড়ান !

তখন আমি মরিয়া !

মালবিকা দাঁড়াল। জানি না সাধারণ ভদ্রতার খাতিরেই কি না ! জিজ্ঞাসা করলাম, হঠাৎ বেরিয়ে এলেন যে ? খাবারের অর্ডার দিয়েও খেলেন না ?

মালবিকা চুপ করে কি যেন ভেবে নিলে। তার পরে আমাকে সোজা প্রশ্ন করে বসলো, কেন বলুন তো ? কি দরকার আপনার ?

কি জবাব দিই এখন ? উত্তেজনার বশে একটা কাজ করে ফেলেছি মাত্র। আমার হঠাৎ মনে হল, এখন যদি মালবিকা চেঁচিয়ে উঠে আমার সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলে দেয়, তাহলেই হয়েছে ! এই কলেজ স্ট্রীটের পথচারীরা সকলে মিলে এখনই চাঁদা করে আমার ধৃষ্টতার শাস্তি দেবে। ব্যাপারটা তাই হালকা করবার জন্যে বললাম, না, তেমন কিছু নয়। একসঙ্গে পড়ি আমরা, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। আপত্তি থাকে যদি বলতে—

মালবিকা হঠাৎ যেন কি ভেবে নিলে। তারপর বললে, আপত্তি ! না না আপত্তি কিসের ?

যাক, ধড়ে প্রাণ এল ! মালবিকা যে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করলে না, সবাইকে ডেকে আমাকে মার খাওয়াবার ব্যবস্থা করলে না—তাও ভাল। আমি যেন কৃতজ্ঞতায় গলে গেলাম, বললাম, এইখানেই বলবেন, না অন্য কোন জায়গায় ?

আমার মুখ থেকে কথাটাকে কেড়ে নিয়ে মালবিক বললে, না, না, এইখানেই বলছি। এমন-কিছু ব্যাপা। নয়।—বলে সে একবার থামলো, কি যেন ভেবে নিলে। তারপরে বললে, আমার ব্যাগটা বোধ হয় চুরি হয়ে গেছে !

আমি বললাম, চুরি হয়ে গেল ? কখন ? কোথায় ?

—তাই যদি জানবো তো যাবে কেন ?—বলেই মালবিকা একটু হাসলো। হেসে বললে, ঠিক বুঝতে পারছি না। বোধহয় ট্রামে। তার হাতের একটা

প্লাস্টিকের ঝুড়ি দেখিয়ে বললে, এরই মধ্যে রেখেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ—

আমি একটু উৎসাহিত হয়েই বলি, তাতে কি হয়েছে ? আমার কাছে তো টাকা রয়েছে, নিন না ! পরে ফিরিয়ে দেবেন।

—না, থাক্।

—থাকবে কেন ?

মাথা হেঁট করে কেমন যেন সলজ্জভাবে মালবিকা বললে, কিন্তু দেখুন, ফিরিয়ে দিতে আমার একটু দেরি হবে। কারণ, আসছে মাসের মাইনেটা যতদিন না পাচ্ছি, ততদিন দিতে পারব না।

আমি একটু হেসে জবাব দিলাম, তাতে কি হয়েছে ? আমারও এমন কিছু তাড়া নেই। বলে আমি পকেট থেকে মনিব্যাগটা বার করে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কত টাকা আপনার দরকার ?

সে বললে, আপাতত ত্রিশটা টাকা হলেই আমার চলে যাবে।

আমি তখনই দশ টাকার তিনখানি নোট তার হাতে দিয়ে দিলাম। মালবিকা হাত পেতে নিলে। এইবার বললাম, আপনার খাওয়া তো হয়নি ? সকাল থেকেই তো দেখছি পড়াশোনাই করছেন। এখন চলুন, কোনও হোটেলে গিয়ে কিছু খেয়ে নেবেন।

খাওয়া তার সত্যিই দরকার। ক্ষিদেও তার নিশ্চয়ই পেয়েছিল। কিন্তু মেয়েদের নাকি খাওয়ার কথা বলতে

বড় লজ্জা। মুখ ফুটে সহজে সে কথা তাদের বলা চলে না। মালবিকা একটু চুপ করে থেকে বললে, ও হোটেলটায় আর যেতে ইচ্ছে করছে না। তার চেয়ে চলুন না কেন সামনের ওই কফি-হাউস নয়তো Y. M. C. A.তে যাওয়া যাক !

—তাই চলুন।—দুজনেই প্রেসিডেন্সি কলেজের দিকের ফুটপাথ ধরে হাঁটতে শুরু করলাম।

* * * *

সেইদিন থেকে মালবিকার সঙ্গে হল আমার পরিচয়। টাকাটা সে অবশ্য পরের মাসেই আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। টাকার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটাও কি ফিরিয়ে দিলে নাকি ? আমার মন আমি তাকে দিয়েছিলাম, কিন্তু তার মন পেয়েছিলাম কিনা, তা বুঝতে পারিনি। চেষ্টার ত্রুটি অবশ্য আমি কোনদিনই করিনি। কলেজ স্ট্রীট ট্রাম-স্টপেজে দাঁড়িয়ে থাকা, দুপুরে একসঙ্গে চা খাওয়া—এসব নিত্যকার ব্যাপার যেমন চলছিল, তখনও তেমনি চলছে।

এম-এ পরীক্ষার তখন আর বিশেষ দেরি নেই। আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম তার মনের কথা জানবার জন্যে। একদিন ভাবলাম, স্পষ্টই তাকে জিজ্ঞাসা করে ফেলি। কিন্তু কেমন যেন লজ্জা হল। জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না, অথচ ব্যাপারটার একটা মীমাংসাও হওয়া দরকার। কারণ দিন চার-পাঁচের মধ্যেই এম-এ পরীক্ষার জন্য আমাদের ছুটি হয়ে যাবে। তখন আর কারো সঙ্গেই কারোরই দেখা হবে না।

এতদিন মালবিকার সঙ্গে মিশছি, কিন্তু আশ্চর্য, তার বাড়ির ঠিকানা সে আজ পর্যন্ত আমাকে বলেনি। দু-একবার জিজ্ঞাসা যে করিনি, তা নয়। কিন্তু বরাবরই সেই এক উত্তর পেয়েছি—পরে জানাবো। পরে জানাবো তো, কিন্তু কবে? তাই মুখে যে-কথা বলতে পারিনি, চিঠিতে সেই কথা লিখে জানাবো বলে ঠিক করলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর কাগজ-কলম নিয়ে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে বসলাম তাকে চিঠি লিখতে। ইনিয়েবিনিয়ে লিখলামও অনেক কথা, কিন্তু কোন চিঠিই ঠিক মনের মত হল না। সব ছিঁড়ে ফেললাম। কি করবো তাই ভাবছি। ঘড়িতে রাত তখন দুটো। ঘুম আর কিছুতেই আসতে চায় না। মাথায় ঠাণ্ডা জল দিলাম। হাওয়ায় পায়চারি করলাম।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। উঠতে দেরি হয়ে গেল। স্নান করে নিয়ে কলেজে যাব বলে বেরুচ্ছি, বৌদির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বৌদি বললেন, এত সকাল-সকাল বেরোচ্ছ যে? স্নান যখন হয়ে গেছে, তখন খেয়ে নাও।

ভাবলাম মালবিকার কথাটা একবার বলি বৌদিকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হল, মালবিকার মনের কথা তো জানি না, কি বলবো? এখন বলা বোধহয় উচিত হবে না। চুপচাপ খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ করে চলে গেলাম কলেজে। আজ যা-হোক কিছু একটা করতেই হবে।

ট্রাম-স্টপেজে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ—কিন্তু কই, মালবিকা তো এল না! এত দেরি তো তার হয় না কোনদিন? কী হলো তার? আশুতোষ-বিল্ডিংয়ের ঘণ্টা পড়লো—ক্লাস শুরু হল। রদ্দুরটা বেশ কড়া হয়ে আসছে—আর দাঁড়িয়েও থাকা যায় না। অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়ে গেছে। তারা মুখে কেউ-কিছু বলেনি বটে, কিন্তু ঠোঁটের কোণে একটা বাঁকা হাসি হেসে চলে গেছে। যার অর্থ আর-কেউ না বুঝলেও আমি বুঝেছি। নীরব ভাষায় ওরা যেন বলে গেল—চাতক-পাখির মতন থাকো দাঁড়িয়ে! পাখি উড়েছে।

একরকম হতাশ হয়েই চলে গেলাম লাইব্রেরিতে। সেখানে কেউ মন দিয়ে পড়ছে, আবার কেউ-বা পড়ার ভান করে সামনে উপবিষ্টা বান্ধবীর চোখে চোখ রেখে নীরবে প্রেম-বিনিময় করছে। অন্য দিন এসব দেখলে আনন্দ হতো। সেদিন কিন্তু ভাল লাগল না। সত্যি কথা বলতে কি, একটু যেন বিরক্তই হলাম। কেবলই ঘুরে ফিরে মনে হয় মালবিকা এল না কেন? তার কি কোন অসুখ করেছে? বাস্তবে মানুষ যখন তার আকাঙ্ক্ষার বস্তুকে না পায় তখন সে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করে। এমনি মানুষের মন। আমিও ঠিক তাই করলাম। ভাবলাম,—হয় তো একটা ছোট্ট ঘরে, ছোট্ট খাটের ওপর সে শুয়ে আছে। দারুণ জ্বর, মাথার যন্ত্রণায় হয় তো সে খুব কষ্ট পাচ্ছে। সেবা করবার কেউ নেই। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে! আহা রে! আমি যদি এই সময় তার কাছে

থাকতে পারতাম! দূর হোক ছাই! ঠিকানাটাও দিয়ে যায়নি, যে গিয়ে একবার খবর নেব।

হঠাৎ চমকে উঠলাম। পিঠে যেন কার হাত পড়লো। মুখ ফিরিয়ে দেখি, সনৎ হাসছে আমার দিকে চেয়ে। বললে, কি হে ব্রাদার! অমন মন দিয়ে কী পড়ছ?

ইয়ারকি-ঠাট্টা তখন আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। সুমুখের খোলা বইটা টেনে নিয়ে বললাম, দেখতেই তো পাচ্ছ ভাই! পরীক্ষার আর তো দেরি নেই।

সে আরো হাসতে লাগলো। হাসতে হাসতে বললে, তা তো জানি! আমাদেরও পরীক্ষা হবে, কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তরগুলো আজকাল বইয়েতে না লেখা হয়ে লেখা হচ্ছে কি মেঝের ওপর?

আমি একটু সচকিত হয়ে গিয়ে বলি, তার মানে?

সে বলে, মানে খুব সোজা। পাঁচ মিনিট হলো তোমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছি। তোমার ভ্রূক্ষেপই নেই! প্রথমটা ভেবেছিলাম মন দিয়ে বুঝি পড়ছো। কিন্তু বইয়ের পাতা উলটাচ্ছ না কেন? তারপর দেখি কিনা তুমি বইয়ের পাতার দিকে চেয়ে নেই—চেয়ে রয়েছ স্রেফ মাটির দিকে। তাই তো তোমার ধ্যান ভাঙ্গাতে হল। অবশ্য উর্বশী মেনকা হলে হয়তো নেচে-গেয়ে ধ্যান ভাঙ্গাতো। আমি শুধু তোমার পিঠে একটা চড় মেরেছি। কিন্তু যার জন্যে এত ভাবনা, তোমার সেই মালবিকা যে এসে গেছে! দোতলার করিডোরে

দাঁড়িয়ে বন্ধুদের সঙ্গে হেসে হেসে কি-সব কথা বলছে। যাও, গিয়ে ছাখো। দেখে চক্ষু সার্থক কর!

নিজের কানকে যেন নিজেরই বিশ্বাস হল না। মালবিকা তাহলে সত্যিই এসেছে! অসুখ করেনি তাহলে? কিন্তু সনৎটার সামনে যাই কেমন করে? এখন আমাকে চেয়ার ছেড়ে উঠতে দেখলেই দাঁত বার করে হাসবে। তাই একটু গম্ভীর হয়ে বলি, আসুক না, তাতে আমার কি?

সে বলে, না, তেমন কিছুই নয়। তবে তুমিও তাকে দেখবার জন্যে ছটফট করছ, আর সেও হয়ত এতক্ষণ— এই আর কি!

আমি একটু কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলি, আচ্ছা তুমি যাও এখন। আমাকে একটু পড়াশোনা করতে দাও।

সনৎ একরকম অপ্রস্তুত হয়েই চলে গেল। আমিও ফাঁক খুঁজছিলাম। সনৎ ধারে কাছে নেই দেখে দোতলার উদ্দেশে চারতলা থেকে নামতে আরম্ভ করলাম।

দোতলার সিঁড়ির মুখেই দেখা হয়ে গেল তার সঙ্গে। আমাকে দেখেই মালবিকা হাসতে হাসতে এগিয়ে এল আমার দিকে। তারপর ব্যাগ থেকে একটা খাম বার করে ধরলো আমার সামনে। চিঠি নাকি? বুকের ভিতর রক্তটা একবার ছলাৎ করে উঠলো। তা সকলের সামনে কেন? আড়ালে তো দিতে পারত! কী অবিবেচক মেয়ে রে বাবা! বুদ্ধিশুদ্ধি কি কোনকালেই হবে না!

তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে নিলাম খামটা। খামের

ওপরে আমার নাম লেখা। খামটা পকেটে রাখতে যাচ্ছিলাম, সময়মত পড়ব বলে। কিন্তু বাধা পেতে হলো! তারই কথায়—না না, ওটা এখুনই পড়ুন, তারপর যাবেন কি না বলুন !

যেতে তো আমি সবসময়েই প্রস্তুত। দেখা যাক্, কোথায় যেতে লিখেছে ও !

খামটা আঁটা ছিল না। খুলতেই তার থেকে বেরিয়ে এল প্রজাপতি-আঁকা একখানি কার্ড ! হাতে লেখা নয়। একেবারে ছাপার হরফে লেখা। আগামী ২০শে বৈশাখ আমার কন্যা কুমারী মালবিকার…অমুকের সহিত…।

ঠিক পড়ছি তো ? মুহূর্তের জন্য আশুতোষ বিল্ডিং, করিডোর, মালবিকা—সব যেন ধোঁয়ায় মিশিয়ে গেল আমার চোখের সামনে থেকে। কিন্তু কতক্ষণ ধোঁয়ায় থাকবো ?—তাই আবার বাস্তবে ফিরে এলাম। দেখি, নাঃ ! সব ঠিক আছে। শুধু মালবিকাই নেই ! তাড়াতাড়ি কার্ডটা খামের মধ্যে পুরে পকেটে রাখলাম। বললাম, আচ্ছা, যাবো।

দাঁড়াতে আর ইচ্ছা হল না, সেখান থেকে তাই চলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু মালবিকাও আমার সঙ্গে নেমে আসতে লাগল !

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে নিজেই কথা বললো, আসবেন আমার বিয়ের দিন। আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

যে মালবিকাকে একটিবার দেখবার জন্যে, যার সঙ্গে

একটি কথা বলবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম, তারই সঙ্গ তখন আমার কাছে বিষ হয়ে উঠেছে। বললাম, আচ্ছা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ভালবেসে বিয়ে করছো না বাবা-মা দেখেশুনে বিয়ে দিচ্ছেন ?

মালবিকা একটু হেসে জবাব দিলে, দুটোই বলতে পারেন।

কেমন যেন একটু অদ্ভুত লাগলো কথাটা। বললাম, তার মানে ?

মালবিকা তখন পরিষ্কার করে আমাকে বুঝিয়ে দিলে। বললে, উনি হলেন, ক্ষীরোদচন্দ্র অ্যাকাডেমির সেক্রেটারির ছেলে। বাবার সঙ্গে আমার শ্বশুরের অনেক দিনের আলাপ। সেই জন্যই তো আমি স্কুলের চাকরিটা পেয়েছি। আর সেই সুযোগেই ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ! বিয়ে আরো আগেই হতো—উনি বিলেত গিয়েছিলেন কিনা! তাই এত দেরি হল।

আর শুনতে পারলাম না। ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করেই বললাম, নমস্কার! আমি এবার বাড়ি যাবো—চলি।

চলে যাবার সময় পেছন ফিরে তাকাতেও ইচ্ছা হলো না। আমার এই রকম ব্যবহারে মালবিকা কি ভাববে, সে প্রশ্নও মনে এল না। যা খুশি ভাবুক সে, তাতে আমার কি ? তাড়াতাড়ি বাইরে এসে ট্রামে উঠে পড়লাম। মনটা হুহু করে উঠলো। তা উঠুক। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসলাম, পরীক্ষায় পাস করতেই হবে, নইলে দাদা মনে বড় দুঃখ পাবে।

নেক রকমের অনেক মানুষ আসে তো
যদি ভাই কাউকে বলে একখানি বাড়ি ঠিক
দিতে পার তো বড় ভাল হয়।

দোকানদার সানন্দে রাজী হয়েছিল।

কথাটা বোধকরি তার মনে ছিল না। বড়দাকে আর আমাকে একসঙ্গে দেখেই তার মনে পড়লো। বললে, বড়দা, তুমি তো অনেকের অনেক উপকার কর। এই ভদ্রলোকের একটা উপকার করবে?

বড়দার মুখে হাসি দেখা গেল।—আমি আবার কখন কার কি উপকার করলাম?

—জানি বড়দা, সবই জানি।

এই বলে দোকানদার এমনভাবে তাকালে বড়দার দিকে যে বড়দার মুখের হাসি চট্ করে বন্ধ হয়ে গেল। মনে হলো বড়দার নাড়ীনক্ষত্রের খবর যেন সে জানে।

হাতের কাপটা নামিয়ে রেখে বড়দা বললে, কি উপকার করতে হবে শুনি?

আমাকে দেখিয়ে দোকানদার বললে, এর-জন্যে একখানি বাড়ি দেখে দিতে হবে। ভাড়ার জন্যে ভাববেন না। এর দাদা মস্ত উকিল। মাসের শেষে ভাড়া পাবেন। বাড়িওলার ভাবনাই থাকবে না কোন। আমার পক্ষ নিয়ে সে বোধ হয় আরো কিছু বলে চলতো, কিন্তু তাতে বাধা দিল বড়দাই।

—আমাকে দেখে কি বাড়ির দালাল বলে মনে হয়? বড়দা জিজ্ঞাসা করলে।

দোকানদার আমার দিকে তাকালে। বললে, এবার বল তুমি। ঠিক লোক ধরিয়ে দিয়েছি।

বলতে যাচ্ছিলাম। বড়দা বললে, চা'টা আগে খেয়ে নিন্, পরে শুনছি।

এর পরে আর কথা বলা চলে না। অগত্যা চায়ে চুমুক দিলাম।

চা খাওয়া শেষ করে বড়দা উঠে দাঁড়ালো। বললে, আসুন। দোকানে বসে কথা হয় না।

দু'জনে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বড়দা তার পকেট থেকে সিগারেটের একটি প্যাকেট বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলে। বললে, নিন্।

বললাম, আমি খাই না।

—ভাল। বলে নিজে একটি সিগারেট ধরিয়ে বড়দা বললে, আচ্ছা চলি। নমস্কার।

এই বলে সত্যি সত্যিই বড়দা চলে যাচ্ছিল।

এ আবার কেমন ধারা মানুষ? পাগল নয় তো? কিরকম বাড়ি চাই, কত টাকা ভাড়া, আবার কবে কোথায় দেখা হবে তার সঙ্গে—কোনও কিছু না বলেই বড়দা চলে যাচ্ছে দেখে হঠাৎ ডেকে বসলাম, বড়দা!

বড়দা ফিরে দাঁড়ালো। হাসতে হাসতে এমনভাবে চাইলে আমার মুখের দিকে, মনে হলো যেন কতকালের চেনা।

বড়দা এগিয়ে আসবার আগে আমিই তার কাছে গিয়ে বললাম, কিরকম বাড়ি, কত ভাড়া—কই কিছুই তো জিজ্ঞাসা করলেন না?

বড়দা বললে, নাই-বা জিজ্ঞাসা করলাম !

বললাম, জানবেন কেমন করে আমি কি রকম বাড়ি চাই ?

—জানলাম তো—তোমার একটি বাড়ি চাই ।

জিজ্ঞাসা করলাম, আবার কখন দেখা হবে আপনার সঙ্গে ?

—কেন ? আমার সঙ্গ কি তোমার খুব ভাল লাগছে ?

—আজ্ঞে না, সেজন্য বলছি না ।

—তবে ? বড়দা জিজ্ঞাসা করে বসলো, কিজন্যে বলছো ?

বলতে কেমন যেন সংকোচ বোধ করছিলাম, তবু বললাম, ধরুন, আপনি একটা বাড়ি ঠিক করলেন, সে-খবরটা আমাকে জানতে হবে তো !

—জানাব ।

—কোথায় জানাবেন ?

—এইখানে । এই—যেখানে দাঁড়িয়ে আছি ।

কথা শুনে হেসে ফেললাম । বললাম, কেন, ওই চায়ের দোকানে কি আপনি রোজ আসেন না ?

—রোজ মানে প্রতিদিন ? বড়দা কেমন যেন মুখ টিপে একটুখানি হেসে জবাব দিলে, না। রোজ আমি মাত্র একটি জায়গায় যাই ।

কোথায় যায় বড়দা ? মনের মধ্যে বেশ একটা কৌতূহল জেগে উঠলো । ভাবলাম জিজ্ঞাসা করি বড়দাকে । আমার সে প্রশ্নের একরকম পূর্ণচ্ছেদ

টেনে দিয়েই বড়দা ফের শুরু করলে—যাক্, ওসব কথা শুনে তোমার কাজ নেই। এসো।

বলে বড়দা হাত বাড়িয়ে আমাকে তার পাশে টেনে নিলে। বললে, চল, পথে পথে একটু ঘুরে বেড়াই। আপত্তি নেই তো ?

হাতে কোন কাজ ছিল না। ভাবলাম, দেখিই না একটু লোকটার সঙ্গে ঘুরে।

অদ্ভুত মানুষ এই বড়দা !

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমাকে সে যেন তার আপনার করে নিলে। আমাকে সে 'তুমি' 'তুমি' বলছিল প্রথম থেকেই। কিছুক্ষণ পরেই বললে, 'আপনি' 'আপনি' কোরো না। ভাল শোনায় না !

বড়দাকে 'তুমি' বলতে বাধ্য হলাম।

বললাম, তোমার সঙ্গে পথের ওপর কেন দেখা করতে হবে বড়দা ? তোমার বাড়ির ঠিকানা বল, আমি সেইখানে গিয়ে দেখা করে আসব।

হঠাৎ বড়দার মুখখানা কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেল। বললে, বাড়ি-ঘর আমার নেই রে ভাই, আমি পথের মানুষ—পথে পথে ঘুরে বেড়ানোই আমার কাজ। তোদের ভাষায় যাকে বলে 'বাউণ্ডুলে', আমি হচ্ছি ঠিক তাই।

এই বলে হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বড়দা আবার একটা সিগারেট ধরালে। একমুখ ধোঁয়া আকাশে উড়িয়ে দিয়ে বললে, তুমি ঘরের ছেলে, ঘর থেকে এসেছ

আবার ঘরে ফিরে যাবে, আর আমি? ঘর হারিয়েছি অনেকদিন। অনেক—অনেকদিন!

বড়দা হঠাৎ যেন তার অতীতদিনের চিন্তায় বিভোর হয়ে গেল। মুখে আর কোনও কথা বললে না। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে চললো পথের উপর দিয়ে।

যে-মানুষ কথা বলে না তার সঙ্গে পথ চলা মুশকিল। ভাবলাম কেটে পড়ি। কিন্তু কেটে পড়তে দিলে না সে।

হঠাৎ যেন বড়দার ধ্যানভঙ্গ হলো। বললে, মানুষ কিরকম স্বার্থপর দেখছ? নিজের ভাবনা নিয়েই মশ্‌গুল! দ্যাখো, মানুষ যদি আর-একটু কম স্বার্থপর হতো, তাহলে এই পৃথিবীটা বোধহয় আর-একটু সুন্দর হতো।

বললাম, স্বার্থপর না হলেই-বা চলবে কেন বড়দা?

—চলবে না?

বড়দা যেন দপ্‌ করে জ্বলে উঠলো।

বললে, ছি ছি, এই শিক্ষা পেয়েছ তুমি! স্বার্থ নিয়ে মাথা ঘামায় তো জীবজন্তুরাই। তাহলে মানুষ হয়ে জন্মালে কেন? ভগবান যে বিবেক-বুদ্ধি বলে জিনিসগুলো দিয়েছেন, সেগুলোর কি কোনই দাম নেই বলতে চাও?

চট্ করে এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না।

পথের ওপর আমাদের দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। রাস্তায় বিস্তর লোক। পাশের একটা সিনেমা-হাউস থেকে লোকজন বেরুচ্ছে। মনে হলো ম্যাটিনী শো ভেঙেছে।

লোকজনকে পাশ কাটিয়ে আমরা অনায়াসে চলে যেতে পারতাম। বড়দা কিন্তু গেল না। দাঁড়িয়ে পড়লো।

সেইখানে। বললে, আজ এসো তুমি। আবার দে
হবে।

বড়দাকে সেদিন সেই সিনেমা-হাউসের সামনে ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। সারা রাস্তা ভাবতে ভাবতে এসেছি সেই মানুষটির কথা। নিজের নাম বললে না, বাড়ির ঠিকানা বললে না। তার ওপর সব চাইতে আশ্চর্য যে, লোকটা দাঁড়িয়ে পড়লো একটা সিনেমা-হাউসের সামনে আর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে দিলে বিদায়! কেন? ও কি সিনেমা দেখতে খুব ভালবাসে? তাই যদি হয়, তাতে আমার সামনে লজ্জা কিসের? ঢুকতেই পারতো, তাতে তো আর কেউ তাকে বাধা দিত না? তবে?

আমার নামও সে জানে না। জানতে চাইলেও না।

মানুষটিকে ঠিক চিনতে পারলাম না।

একটা আকর্ষণী শক্তি যে তার আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। একবার দেখলে তাকে ভোলা যায় না—সেকথাও সত্যি। কিন্তু ঘরবাড়ি তার নেই, পথে পথে ঘুরে বেড়ায়—সে আবার কিরকম কথা! ফরসা জামা-কাপড় পরে, দামী সিগারেট খায়। খুব যে গরিব তাও তো মনে হলো না।

বড়দার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে, একটা বাড়ির সন্ধান সে নিশ্চয়ই দিতে পারবে—এই আশায় তার পরদিন থেকে রোজই সেই চায়ের দোকানে গেছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেছি রাস্তার ওপর, কিন্তু বড়দার দেখা পাইনি।

সেদিন বিরক্ত হয়ে বললাম গিয়ে চায়ের দোকানদারকে ঃ

—বেশ লোক ধরিয়ে দিলে তুমি! সেদিন থেকে বড়দার কোনও পাত্তা নেই।

কথাটা শুনে দোকানদার কিন্তু বিচলিত হলো না। বললে, ও এম্‌নিই। আবার একদিন হুট্‌ করে এসে হাজির হবে দেখো।

সাত দিন পার হয়ে গেল।

হুট্‌ করে এসে হাজির সে হলো না!

এদিকে বাড়িতে আমার তিষ্ঠুনো দায় হয়ে উঠলো। উঠতে বসতে বৌদি বলে, কোনও কাজের নও তুমি ঠাকুরপো। কলকাতার মত এত বড় শহরে একটা বাড়ি খুঁজে বের করতে পার না?

—খুঁজেও বেড়াচ্ছি, বাড়িও দেখছি, কিন্তু কোনোটাই ঠিক মনের মত হচ্ছে না বৌদি।

বড়দার কথাটা কিন্তু বৌদিকে বলিনি। বললে কি জবাব পেতাম তা আমি জানি।

আগেকার দিনে ফাঁকা বাড়ির দেয়ালে 'টু লেট' লেখা থাকতো। জানলায় 'টু লেট'-লেখা কাগজ ঝুলতো। আজকাল আর অত সহজে ফাঁকা বাড়ি চেনবার উপায় নেই। কাগজে বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন অবশ্য বেরোয়, কিন্তু বিজ্ঞাপন দেখে যেখানেই গেছি, সেইখানেই ঠকেছি। হয় ভাড়া অত্যন্ত বেশি, আর নয়তো এমন সব হাজারো রকমের বায়নাক্কা যে, হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে।

সেদিন ট্রামে চড়ে কোথায় যেন যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি, বড়দা ওদিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি ট্রাম থেকে নেমে পড়লাম।

রবিবারের বিকেল। রাস্তায় গাড়ি আর লোকজনের ভিড়। চট্ করে ওদিকের ফুটপাতে যেতে পারলাম না। এদিকে ফুটপাতে এসে দাঁড়ালাম। সামনে থিয়েটারের শো ভেঙেছে। লোকজন বেরুচ্ছে থিয়েটার থেকে।

সেদিনও এমনি একটা সিনেমা-হাউসের সামনে বড়দাকে ছেড়েছিলাম।

বড়দার দিকে আমি তাকিয়ে আছি। কিন্তু বড়দা তাকিয়ে আছে অন্যদিকে। থিয়েটারের যে-পথ দিয়ে মেয়েরা বেরিয়ে আসছে, দেখলাম একাগ্রদৃষ্টিতে বড়দা সেইদিকে হাঁ করে তাকিয়ে। মনে হলো যেন কারও জন্য অপেক্ষা করছে বড়দা।

এসময় তার কাছে যাওয়া উচিত নয়। ভাবলাম দেখাই যাক্ শেষ পর্যন্ত।

দেখলাম। মেয়েরা চলে গেল। রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে গেল। থিয়েটারের সুমুখে লোকজনের যাওয়া-আসা কমে এলো। বড়দা কিন্তু তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে।

বড়দা তাহলে কারও জন্যে অপেক্ষা করছে না। কিংবা যার আসবার কথা ছিল সে আসেনি।

ধীরে ধীরে বড়দার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তার গায়ে হাত দিয়ে ডাকলাম, বড়দা!

বড়দা যেন চমকে উঠলো। আমার কাঁধে হাত দিয়ে প্রথম কথাই জিজ্ঞাসা করলে, বাড়ি পেলে?

বললাম, কোথায় পাব? তুমি তো দিলে না একটা খুঁজে!

বড়দা বললে, তুমি বুঝি আমার আশায় বসে আছ? তবেই হয়েছে!

তার মানে? এই যে চায়ের দোকানের মালিক বললে, বড়দা সকলের উপকার করে বেড়ায়! এ কি রকম লোক? যে অনুরোধ করলে কথা রাখে না। অবশ্য সেজন্য তাকে কোন দোষও দেওয়া যায় না। করা বা না করা তার ইচ্ছা।

বড়দা বলে, কি ভাবছ এত? এস আমার সঙ্গে। এই বলে বড়দা আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ঢোকালে একটা রেস্টুরেণ্টে। বললে, বল কি খাবে!

বললাম, শুধু এক পেয়ালা চা।

—কখ্‌খনো না। তুমি আমাকে বড়দা বলে ডেকেছ। না খাইয়ে ছাড়ব না। খাও।

আমি তো অবাক্। দেখা হলেই যে এতটা আত্মীয়তা করে, চোখের আড়ালে গেলেই সে সব ভুলে যায়?

খুব একপেট খাইয়ে দিলে বড়দা। নিজে কিন্তু কিছু খেলে না। বললে, আমাকে শুধু এক পেয়ালা চা দাও।

চায়ের পেয়ালাটি হাতের কাছে নিয়ে বড়দা আমাকে সেদিন অনেক কথাই বলেছিল।

কথাগুলো ভাল।

বলেছিল, আমি নাকি পরের উপকার করে বেড়াই—এই কথাটা কে যে রটিয়ে দিলে আমার নামে কে-জানে। দেখলে না—সেদিন তোমাদের পাড়ার চায়ের দোকানদার কি রকম বললে? আমি প্রতিবাদ করতে গেলাম তো সে বলে কিনা আমি জানি।

মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো বড়দা।

তখন সে হাসির মানে আমি বুঝতে পারিনি। বড়দার কথাগুলো শুনেই গিয়েছিলাম শুধু।

বড়দা বলেছিল, তার জন্যে আমার বিপদের অন্ত নেই। এই যেমন ধর, তোমার বাড়ি খুঁজে দেওয়া। এটা কি একটা উপকার নাকি? তোমরা যদি ধর, আমার মত পথে পথে ঘুরে বেড়াতে, কি গাছের তলায় বাস করতে, তাহলেও-বা একটা ঘর দেখে দিতে পারলে কিছু উপকার করা হতো।

এই বলে চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বের করে একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বড়দা বললে, আরে ভাই, কারও উপকার কেউ করে না, করতে পারে না। মানুষ যা কিছু করে—সব নিজের জন্যে। অপরের উপকারও যে করে, তা নিজের ভাল লাগে বলেই করে। আসলে মানুষ হচ্ছে গিয়ে স্বার্থপর। জানোয়ারের উন্নত সংস্করণ। নিজের উপকার করবার জন্যেই মানুষ ব্যস্ত—পরের দিকে তাকাবার অবসর পর্যন্ত নেই। যাক্‌গে ও-সব বাজে কথা বলে কোনও লাভ নেই। খাও তুমি। খুব পেট ভরে খাও। খেয়ে দেয়ে সবাইকার

কাছে বলে বেড়াবে—বড়দা খুব পরোপকারী, খুব খাওয়ায় লোককে।

বলেই বড়দা হোহো করে হাসতে লাগলো।

এতক্ষণ যে রইলাম বড়দার সঙ্গে, এত যে কথা হলো, কিন্তু নিজের জীবনের একটি কথাও সে বললে না।

জিজ্ঞাসা যে আমি করিনি তা নয়। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, থিয়েটারের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছিলে তুমি? কারও জন্যে অপেক্ষা করছিলে বুঝি?

—না না, এমনি দাঁড়িয়ে ছিলাম।

বললাম, সেদিনও অমনি সেই সিনেমা-হাউসটার সামনে তুমি দাঁড়িয়ে পড়লে। পেছন ফিরে দেখলাম তুমি সেইখানে দাঁড়িয়েই আছ।

বড়দা মুখ টিপে হেসেছিল কথাটা শুনে। বলেছিল, হঠাৎ তোমার আবার এ কৌতূহল কেন? ধরে নাও যাহোক্ একটা-কিছু। ধরে নাও আমি মেয়েদের দেখছিলাম। কত সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে আসে সিনেমা-থিয়েটার দেখতে, কত বাড়ির বৌ, কত বাড়ির মেয়ে, সহজে যাদের দেখতে পাওয়া যায় না—তাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিলাম—

এর পর আর কোনও কথা চলে না।

নিজেকে এমনি রহস্যাবৃত করে রাখাই যেন বড়দার স্বভাব।

সেদিন অমনি আমাকে রেস্টুরেণ্টে খাইয়ে, ভাবোল অনেককিছু বলে বড়দা তো চলে গেল।

বড়দার আশা আমি ছেড়েই দিলাম।

বৌদি সেদিন একটা খবরের কাগজ এনে আমার সামনে ফেলে দিয়ে বললে, বেশ লোককে আমি বাড়ি খুঁজতে বলেছি যাহোক্। নাও এইটে পড়।

—আজকের কাগজ? পড়েছি তো!

বৌদি বললে, পড়েছ তো এইটে নজরে পড়েনি? ওই ভাখো—আমি দাগ দিয়ে রেখেছি।

দেখলাম, বাড়িভাড়ার একটা বিজ্ঞাপনের ওপর বৌদি দাগ দিয়ে রেখেছে।

'উত্তর কলিকাতার একটি সম্ভ্রান্ত পল্লীতে একখানি বাড়ি খালি আছে। ভাড়া ১২৫৲ (একশ' পঁচিশ টাকা)। সন্ধান নিতে হবে—১৩, বীরেশ্বর বসু লেনে।'

নাও এবারে খোঁজো! কলকাতা শহরের হাজার হাজার লেনের ভেতর বীরেশ্বর বসু লেন খুঁজে বের কর!

কলকাতার স্ট্রীট ডাইরেক্টরি কিনতে পাওয়া যায় জানি। কিন্তু হাতের কাছে কি পাওয়া যায় ভাবতে গিয়ে মনে পড়লো—ডায়েরি-বইএ কলকাতার পথ-ঘাটের নিশানা ছাপা থাকে দেখেছি।

দাদা উকিল। বড় বড় পুরনো ডায়েরি তার বসবার ঘরে এক গাদা পড়ে আছে। তারই ভেতর থেকে একটা টেনে এনে অনেক খুঁজে খুঁজে বের করলাম ঠিকানাটা। চিৎপুর থেকে একটা রাস্তা বেরিয়ে গিয়ে পড়েছে

.োয়, তারপর সেই আহিরীটোলার একটা গলি কাছে আর-একটা গলি ধরে বেরিয়ে গেলে পাওয়া যাবে বীরেশ্বর বসু লেন।

বেরিয়ে পড়লাম সেইদিনই বিকেলে।

কলকাতায় অনেকদিন রয়েছি। রাস্তা বের করতে দেরি হলো না। পুরনো কলকাতার এঁদো গলি একটা। গলিটা এঁকে বেঁকে গঙ্গার দিকে চলে গেছে।

বীরেশ্বর বসুর লেন পেয়েও কিন্তু নিস্তার নেই। তেরো নম্বর আর পাই না কিছুতেই।

এখানে দশ তো তার পাশের বাড়িটা উনিশ। গলির ভেতর গলি, তার ভেতর গলি। হাঁ করে বাড়ির নম্বর দেখে দেখে এগিয়ে চলেছি। শেষে অনেক ঘোরাঘুরির পর, দুটি ছোট ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করতেই ছেলেদুটো কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালে আমার মুখের দিকে। একটা ছেলে চোখদুটো বড় বড় করে বলে উঠলো, ওরে বাব্বা, খ্যাঁকশেয়ালীর বাড়ি—ওই তো তেরো নম্বর!

সর্বনাশ! ছেলেটা বলে কি! খ্যাঁকশিয়াল!

আঙুল বাড়িয়ে যে-বাড়িটা সে দেখিয়ে দিলে, তাকিয়ে দেখলাম—তার সদর দরজার চৌকাঠের ওপর টিনে-লেখা নম্বর-প্লেটটা ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেছে। কাজেই সেটা আমার নজরে পড়েনি। অথচ এই বাড়ির সুমুখ দিয়ে বারকতক আমি ঘোরাফেরা করেছি।

এগিয়ে গিয়ে দোরের কড়া নাড়লাম। ভেতর থেকে একটা হুংকার শোনা গেল। মনে হলো কেউ যেন আসছে।

স্ত

এলো। পেছন থেকে দো

ওপর পা ছড়িয়ে

পেলাম। আর শুনলাম কে যেন বলছে,

গেলাম বাড়ির

বাবা বিজ্ঞাপন দিয়ে!

বলেই যে-মূর্তিটির আবির্ভাব হলো, ছেলেরা ে

ড়িটা

তাকেই বলেছিল খ্যাঁকশেয়াল।

তা খ্যাঁকশেয়ালই বটে! মানুষের চামড়া দিয়ে ঢাকা ওরকম একটি সজীব কঙ্কাল আমি কখনও দেখিনি। তার ওপর বড় বড় গোল গোল দুটি চোখ।

লোকটি বেরিয়ে এসে দোরের একটা কপাট চেপে ধরে আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো।

চুপ করে আছে কেন বুঝতে পারছি না। তার মুখের দিকে তাকাতে ভয় ভয় করছে। হঠাৎ বিড়বিড় করে কি যেন সে বলে উঠলো। তাকালাম তার দিকে। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম—তার চুপ করে থাকবার হেতু। লোকটি হাঁপানির রুগী। টান উঠেছে। সেইটে সে প্রাণপণে চেপে রয়েছে।

খুব অস্বস্তি বোধ করছিলাম। ভাবছিলাম—এখানে না এলেই ভাল করতাম। এমন সময় লোকটি কথা বললে।

—চলুন! বাড়িটা আপনাকে দেখিয়ে দিই।

কথাই শুধু বললে না, লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে এলো রাস্তার ওপর। বললে, এই নিয়ে বার-দশেক হলো। আমার হয়েছে যেন বাপের দায়।

দিব্যি সহজ মানুষের মত কথা বলতে বলতে এগিয়ে চললো।

...ায়, তারপর মামাশ্বশুরের বাড়ি। বুঝলেন ? ব্যাটা কাছে আর-একটা ...স মাসে বাড়িভাড়া পায়—তা কম করেও ...গৌরেশ্বর বসু এক টাকা।

বেরিয়ে যাচ্ছিলাম তার পিছু পিছু। হঠাৎ সে পেছন ফিরলো। চট্ করে আমি একটু সরে দাঁড়ালাম। লোকটি কিন্তু আমার দিকে এগিয়ে এলো। তার সেই বীভৎস মুখখানা আমার দিকে বাড়িয়ে, বড় বড় দুপাটি দাঁত বের করে খিঁচিয়ে উঠলো।—তুই ব্যাটা আমাকে কিছু দিবি ?

এ আবার কিরকম কথা ? কি জবাব দেবো বুঝতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল, পালিয়ে যাই এখান থেকে।

লোকটি আবার কথা বললে।—হারামজাদার কেমন আক্কেল দেখেছেন ? বড়লোকগুলো এমনি বে-আক্কেলেই হয়।

এতক্ষণে বুঝলাম—কথাগুলো সে আমাকে বলেনি। বলছে তার সেই মামাশ্বশুরকে।

আবার বলতে বলতে সে এগিয়ে চললো।—আমি শালা মরছি নিজের বেয়ারামের জ্বালায়, আর তোর হলো গিয়ে কাজ বাগাবার মতলব ! আমার ওপর লোকজনকে বাড়িটা দেখাবার ভার দিয়ে নিজে পুরী গিয়ে বসে রইলেন !

খান-পাঁচছয় বাড়ির পরেই চমৎকার একখানি দোতালা বাড়ি। বাড়িখানা দেখিয়ে সে বললে, এই বাড়ি। যান দেখে আসুন ভেতরে ঢুকে। আমি বসি এইখানে। খোলাই আছে।

এই বলে সে বাড়ির সুমুখের রকের ওপর পা ছড়িয়ে বসে হাঁপাতে লাগলো। আমি ঢুকে গেলাম বাড়ির ভেতর।

ওপর নীচে চারখানা মাত্র ঘর হলে কি হবে, বাড়িটা চমৎকার। বাইরের ঘরখানা ভালো। দাদা উকিল। বৌদির পছন্দ হবে। রান্নাঘর, বাথরুম বেশ বড় বড়। ভাড়া তো লিখেই দিয়েছে—একশ' পঁচিশ।

যাক, এতদিন পরে একখানা বাড়ি পাওয়া গেল। বৌদি খুশী হবে। কাল সকালেই বৌদিকে নিয়ে আসব।

এই কথাই বলবার জন্যে বেরিয়ে আসছি বাড়ির ভেতর থেকে, হঠাৎ মনে হলো যেন লোকটি কার সঙ্গে কথা বলছে ছুঁড়ে ছুঁড়ে। কিন্তু যে-লোকটি তার কথার জবাব দিচ্ছে তার গলাটা যেন চেনা চেনা।

আমি বেরিয়ে আসতেই কথা তাঁদের বন্ধ হয়ে গেল।

লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, পছন্দ হলো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বললাম, আপনি কার সঙ্গে কথা বলছিলেন ?

লোকটি বলে উঠলো, যার সঙ্গেই কথা বলি না, তাতে আপনার কি ? বাড়ি আপনার পছন্দ হলো কিনা তাই বলুন। বাড়ি দেখতে এসেছেন, বাড়িই দেখুন। অত কুলজীর খবরে আপনার দরকার কি মশাই ? এখন বলুন, বাড়ি আপনার পছন্দ হল কি না ? আমাকে ছুটি দিন।

বললাম, কাল সকালে আমার বৌদিকে আনবো দেখাবার জন্যে।

—আবার বৌদি আসবে? জ্বালালেন দেখছি। তারপর আবার দাদা আসবে। তার ওপরেও আর কেউ আছে নাকি?

এই বলে লোকটি নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে লাগলো।

আমি কিন্তু এদিকওদিক তাকাচ্ছিলাম। যার সঙ্গে সে কথা বলছিল তার গলার আওয়াজটা তখনও আমার কানে যেন লেগে রয়েছে। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, কার সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন বলুন না।

লম্বা হাতের একটা লম্বা আঙুল বাড়িয়ে সুমুখের বাড়িটা সে দেখিয়ে দিলে। বললে, ওই বাড়ির নীচের ঘরে যিনি থাকেন, তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি নাম ভদ্রলোকের?

আমাকে খেঁকিয়ে উঠে বললে—নাম-টাম জানি না মশাই। নতুন এসেছে।

—নতুন এসেছে?

—হ্যাঁ। মাস তিন-চার হবে। লোকটি খুব ভাল।

এগিয়ে গিয়ে দেখে আসবো কিনা ভাবছিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, বাড়িতে মেয়েছেলে আছে, না ভদ্রলোক একা থাকেন?

লোকটি চটে গেল। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো: জানি না মশাই, ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন। বলি ও মশাই, শুনছেন? এই দেখুন, ইনি কি বলছেন।

—কি বলছেন ?

একটা শার্ট গায়ে দিতে দিতে যে-লোকটি বেরিয়ে এলো, তার দিকে তাকিয়েই দেখি, ঠিক যা ভেবেছিলাম তাই, ভুল আমার হয়নি।

—বড়দা ! তুমি এখানে ?

বড়দা বললে, হ্যাঁ, চোখের সামনেই যখন দেখতে পাচ্ছ, তখন আপাততঃ এইখানেই।

আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালো বড়দা। বললে, বিজ্ঞাপন পড়ে বাড়ি দেখতে এসেছ ?

বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু এ-বাড়ির খবর তো তুমিও আমাকে দিতে পারতে ?

বড়দা বললে, হ্যাঁ পারতাম। কিন্তু এ-বাড়ির হাঙ্গামা অনেক। তোমরা এ-বাড়ি নেবে না আমি জানি।

বললাম, কেন নেবো না ?

এসো, বলছি। বলেই বড়দা আমাকে টেনে নিয়ে চলে যাচ্ছিল।

থ্যাকশেয়ালটি চেঁচিয়ে উঠলো : আমি তাহলে চললাম।

বড়দা বলে দিলে, যান না !

লোকটি উঠলো। বললে, শুনে কৃতার্থ হলাম।

তারপর আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে গেল, যা করবার কালকেই করবেন। আমাকে আর জ্বালাবেন না।

মুখ ফিরিয়ে তাকে জবাব দিতে যাচ্ছিলাম, বড়দা বললে, থাক আর ওকে কিছু বলতে হবে না। শোনো।

যাঁর বাড়ি, তাঁর বায়নাক্কা অনেক। পাঁচশ' টাকা অগ্রিম দিতে হবে। তার রসিদ পাবে না। মাসে পঁচিশ টাকা করে কেটে একশ' টাকা করে ভাড়া দিয়ে যেতে হবে—প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে।

বললাম, আমার দাদা উকিল। সে-সব দাদা বুঝবে।

—বেশ তাহলে তোমার দাদাকে গিয়ে বল এই কথা।

বললাম, বৌদিকে কাল সকালে নিয়ে আসব।

বড়দা বললে, আনবার আগে বৌদিকে আরও দুটো শর্তের কথা বোলো।

—আরও শর্ত আছে নাকি ?

—আছে। বড়দা বললে, কয়লার উনোনে রান্না করতে পারবে না। ইলেকট্রিক স্টোভে রান্না করতে হবে।

—আর-কিছু ?

—দেয়ালে পেরেক পুঁততে পারবে না। বাড়িতে মুরগি রান্না করতে পারবে না। মদ্যপান করতে পারবে না।—এমনি-সব পাগলামি আরও আছে। ছ'মাস ধরে শুনছি, বাড়িটা অমনি খালি পড়ে আছে। ভাড়াটে আসছে না।

বললাম, এই-সব কথা বলিগে দাদা-বৌদিকে। শুনেও যদি আসে তো আসবে।

বড়দা বললে, ইলেকট্রিক স্টোভে রান্নাও নাহয় করলে, মুরগি খাচ্ছ, না গরু খাচ্ছ, মদ খাচ্ছ না গাঁজা খাচ্ছ—সে-সব কেউ দেখতে আসবে না। আপত্তি শুধু পাঁচশ' টাকা অগ্রিম, আর সেই অগ্রিম টাকার রসিদ

দেবে না। এই জন্যেই কেউ আসতে চাচ্ছে না। বিজ্ঞাপন দিয়েছে তো এই সেদিন।

বললাম, বাড়িটা কিন্তু ভাল ছিল। তাছাড়া তুমি থাকবে বাড়ির সামনে।

ম্লান একটু হাসি ফুটে উঠলো বড়দার মুখে। বললে, আমার মত লোক বাড়ির সামনে না থাকাই ভাল।

আমার দাদা ব্যস্ত তার মক্কেল আর আদালত নিয়ে। বাড়ির কথাটা তাকে বলবার অবসরই পেলাম না। বৌদিকে বললাম। বললাম—বাড়িটা দেখতে যদি চাও তো বল, কাল দেখিয়ে আনি।

—তোমার দাদাকে একবার জিজ্ঞাসা করি। বৌদি বললে।

জিজ্ঞাসা করতে করতেই পাঁচ দিন পার হয়ে গেল।

ভাবলাম একদিন বড়দার কাছে যাই, তাও যেতে পারলাম না।

ছ'দিনের দিন সকালে বৌদি বললে, না ভাই, তোমার দাদা ও-রকম বাড়ি নেবে না। তুমি ওদের জবাব দিয়ে এসো।

কথাটা আগে বলতে কি হয়েছিল ? খ্যাঁকশেয়ালী বুড়ো হয়ত আমাকে গিলতে আসবে।

তা এলে আর কি করবো ! তবু আমাকে যেতে হবে। বড়দার সঙ্গে দেখা করে আসব।

সেই দিনই গেলাম।

বুড়োর বাড়ি পর্যন্ত যেতে হলো না। বীরেশ্বর বসু লেনে ঢুকেই দেখি—লোকে লোকারণ্য। ছোট গলি। লোকজনের ভিড় ঠেলে একটুখানি এগিয়ে যেতেই দেখলাম—বড়দা যে-বাড়িটায় থাকে, তারই সামনে গোলমাল যেন সব চেয়ে বেশী। যে-বাড়িটা আমাদের নেবার কথা ছিল তার সুমুখে রকের ওপর কঙ্কালসার সেই লোকটা বসে বসে হাঁপাচ্ছে।

তারই কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে মশাই ?

লোকটার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। তার সেই বড় বড় চোখ দুটো যেন আরও বড় হয়ে উঠলো। সেদিনের মত মনে হলো আজও যেন সে তার হাঁপানির টানটা সামলে নিচ্ছে।

পাশেই যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি আমার দিকে কটমট করে তাকালেন। বললেন, চুপ করুন মশাই, দেখুন না কি হচ্ছে !

দেখতে তো সবই পাচ্ছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না যে !

এতক্ষণ পরে কঙ্কালসার সেই লোকটি কথা বললে। বোধকরি হাঁপের টানটা সামলে নিয়েছে। বললে, আমরাও তাজ্জব বনে গেছি মশাই। আপনি তো চিনতেন অরুণ-বাবুকে ?

বুঝলাম বড়দার কথাই বলছে। বড়দার নাম যে অরুণবাবু—তা এই প্রথম শুনলাম। বললাম, হ্যাঁ চিনতাম। কি হয়েছে তাঁর ?

—কি জানি মশাই, জেল-হাজত নাকি হয়েছে বলছে। পুলিস তার জিনিসপত্র সার্চ করতে এসেছে।

কে একজন বললে, সার্চ করতে আসেনি। কি যেন নিতে এসেছে। ওই তো চামড়ার স্যুটকেসটা নিয়েই যাচ্ছে। আচ্ছা হয়েছে ব্যাটার! যেমন ভিজে বেরালটির মত থাকতো! লোকটাকে দেখেই আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল।

খ্যাঁকশেয়ালী চেঁচিয়ে উঠলো, খুব লোক চেনো তুমি! কি মশাই, আপনি কি বলেন? লোকটা খারাপ?

আমার দিকে তাকিয়ে সে আমাকে সাক্ষী মানলে।

বড়দার আমি কতটুকুই-বা জানি! তবু বললাম, আমার তো ভাল লোক বলেই মনে হতো।

—বলুন তো মশাই বলুন তো! পুলিসের কাছে বলুন তো!

সর্বনা[illegible] [illegible]িসের ব্যাপারে আমি থাকতে চাই না মশাই, [illegible]ছিলাম এই বাড়িটার কথা আপনাকে বলতে [illegible] আমাদের নেওয়া হবে না।

[illegible]চিয়ে উঠলো খ্যাঁকশেয়ালী!—আরে মশাই, চু[illegible]াড়ি!

[illegible]ল সে তার লম্বা হাতটা বাড়িয়ে পুলিসকে [illegible] চেষ্টা করতে লাগল। সুমুখে যে-লোকগুলো [illegible] লোকজনদের আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের [illegible] কুকথ্য ভাষায় গালাগালি করতে শুরু করলে।

আর সেই অবসরে আমি চুপি চুপি সরে পড়লাম সেখান থেকে।

সারাটা পথ শুধু বড়দার কথাই ভাবতে ভাবতে এলাম। লোকটার আচার-আচরণ সবই কেমন যেন রহস্যাবৃত বলেই মনে হয়েছিল। কিন্তু জেল-হাজতে যাবার মত এমন কী কাজ করলে সে?

বড়দা জেল-হাজতের আসামী! মনটা যেন কিছুতেই তা মেনে নিতে চাইল না। অথচ প্রত্যক্ষ ঘটনাকেও অবিশ্বাস [illegible]তে পারি না। কত রকমের কত মানুষ আছে এই পৃ[illegible] আর তার হিসাব রাখছে?

কিন্তু এইখানেই [illegible]ষ নয়।

এদিক ওদিক ঘুরে [illegible]ড়ি যখন ফিরলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দাদার [illegible]ক তাকিয়ে দেখি, একজন মাত্র মক্কেল বসে আছে [illegible] এই উপযুক্ত সুযোগ, বাড়িটার কথা দাদাকে [illegible] ও-পাড়ায় যাওয়া হয়নি, ভালই হয়েছে। কি[illegible] গিয়ে বুকটা আমার ছ্যাঁৎ করে উঠলো। যে-লো[illegible]ক্কেল ভেবেছিলাম, তাকে যে এরকম অবস্থায় এ[illegible]বো তা আমি ভাবতেও পারিনি। ভাগ্যিস লোক[illegible]কে দেখতে পায়নি। দোরের পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে[illegible] এলাম সেখান থেকে।

বৌদিকে গিয়ে বললাম, বৌদি, হরিবা[illegible] এসেছে দাদার কাছে?

বৌদি অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইলো আমার মুখের দিকে।

—কে হরিবাবু ?

দু'বছর আগের কথা। বৌদি ভুলে গেছে। বললাম, আচ্ছা ভুলো মন তো তোমার! সেই যে সেই লোকটা— এই পাড়ায় থাকতো গো। হরিবাবু। হরিচরণবাবু!

—পাড়ায় তো অনেক লোক থাকে ঠাকুরপো! সবাইকে কি আমি মনে করে রেখেছি ?

এই বলে বৌদি চলে যাচ্ছিল। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললাম, ললিতার বাবা।

—তাই বল !

বৌদি হাসতে হাসতে থমকে থামলো।—ললিতাকে এখনও তুমি ভুলতে পারনি ঠাকুরপো ?

বৌদিকে কি আর বলবো ? চুপ করে রইলাম।

বৌদিকে বললাম, দাদাকে একবার চুপি চুপি জিজ্ঞাসা কোরো লোকটা কেন এসেছে।

—যে-জন্যেই আসুক, তোমার বিয়ের জন্যে নয়।

কথাটা বলেই বৌদি আবার হাসতে লাগলো। হাসতে হাসতে বললে, তোমার দাদা ললিতার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবে না ঠাকুরপো। ললিতাকে তুমি ভুলে যাও।

বৌদি তো বলেই খালাস!—'ললিতাকে তুমি ভুলে যাও!'

ভুলে যাওয়া এত সহজ কিনা! ললিতাকে আমি ভুলি কেমন করে ?

ললিতার বাবাটা কিন্তু শয়তানের একশেষ! আমাদের বাড়ি তিনি প্রথম এসেছিলেন দাদার কাছে টাকা ধার করতে। পঞ্চাশটা টাকা তিনি নিয়েও গিয়েছিলেন তিন দিন পরে ফিরিয়ে দেবেন বলে। কিন্তু তিন দিনের জায়গায় তিন সপ্তাহ তিনি আর এ-মুখো হননি।

দাদা পাঠিয়েছিল আমাকে সেই টাকার তাগাদায়।

আর সেই টাকার তাগাদা করতে গিয়েই ললিতার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

ললিতার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের দিনটি জীবনে এক অবিস্মরণীয় দিন। সেকথা আজও আমার পরিষ্কার মনে আছে।

আমি গেছি ললিতার বাবার কাছে টাকার তাগাদা করতে। ভাবতেও পারিনি তারই বাড়িতে অমন সুন্দরী একটি মেয়ে আছে। কেমন করে হরিবাবুকে অপমান করবো, কি রকম ভাবে কি কি কড়া কথা তাঁকে শুনিয়ে দিয়ে আসবো—মনে মনে সেই সব কথা ভাবতে ভাবতে তাদের দোরে গিয়ে দাঁড়ালাম। সামনের দরজাটা খোলাই ছিল। বন্ধ করবার উপায় নেই। বাড়িতে অনেকগুলো ভাড়াটে। নীচের তলায় একখানা-ছু'খানা করে ঘর নিয়ে কত রকমের কত লোক যে বাস করে তার ইয়ত্তা নেই। ভেতরে ঢুকে বন্ধ একটা দোরের কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলাম, হরিবাবু! হরিচরণবাবু!

উলটো দিকের একটি দরজা হুট্ করে খুলে গেল।

সেইদিকে তাকাতেই দেখি, নবোদ্ভিন্নযৌবনা পরমা-সুন্দরী একটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। চোখে চোখ পড়তেই মেয়েটি তার চোখ নামিয়ে নিলে। বললে, বাবা বাড়িতে নেই।

আমার মুখ দিয়ে তখন আর কথা বেরুচ্ছে না। কেমন যেন একটা অদ্ভুত রকমের অনুভূতি হচ্ছে আমার সর্ব-শরীরে। মনে হচ্ছে আমি যেন কাঁপছি থরথর করে। কেমন যেন একটা অভূতপূর্ব আনন্দে আমার সমস্ত মনপ্রাণ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। এমন কোনও কথা আমার জানা নেই যে-কথা দিয়ে আমি বুঝিয়ে দিতে পারবো—আমার তখনকার মনের অবস্থা। 'অনির্বচনীয়' কথাটা আমি পড়েছি অনেকবার। কিন্তু তার মানেটা ঠিক বুঝতে পারিনি। এখন মনে হচ্ছে যেন আমার সেদিনকার সেই আনন্দের একমাত্র বিশেষণ হতে পারে—অনির্বচনীয়।

এর আগে মালবিকাকেও দেখেছি, তার সঙ্গে আলাপও করেছি, কিন্তু এমন আনন্দের অনুভূতি তো তখন হয়নি? ওকে দেখা মাত্রই আমার যেন মনে হল, ও আমার কত চেনা—কত আপনার!

অনেক সুন্দরী মেয়ে আমি দেখেছি। হয়ত-বা তারা ললিতার চেয়েও সুন্দরী। কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল যেন সারা পৃথিবীর মধ্যে ললিতার চেয়ে সুন্দরী আর কেউ নেই। মনে হয়েছিল যেন এই মেয়েটিকে দেখবার জন্যে এতদিন ধরে আমি প্রতীক্ষা করেছি। আজ আমার

সে প্রতীক্ষার শেষ হলো। তাকে একটিবার চোখে দেখেই যেন ধন্য হয়ে গেলাম।

নিতান্ত সাধারণ একখানি রঙিন শাড়ি পরে ললিতা এসে দাঁড়িয়েছিল আমার চোখের সুমুখে। তাও আবার কাঁধের কাছে শাড়িটা ছিল ছেঁড়া। কানে ছিল দুটি লাল পাথরের দুল, আর হাতে ছিল কয়েকগাছা রেশমী কাঁচের চুড়ি। মাথার অপর্যাপ্ত কালো চুল ছিল পিঠের ওপর খোলা। মুখখানি ছিল বিষণ্ণ ম্লান।

তবু মনে হলো যেন কত সুন্দর!

মনে হলো যেন দেবীপ্রতিমা! মনে হলো ওকে যেন আমি পুজো করতে পারি।

অমন করে চুপচাপ কতক্ষণই-বা দাঁড়িয়ে থাকা যায়! বললাম, আমি অমরবাবুর ভাই।

ললিতা বললে, জানি।

এগিয়ে গেলাম একটুখানি। জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন করে জানলে?

—বাবার কাছে শুনেছি।

—কি শুনেছ?

—আপনার দাদা টাকা পাবেন আমার বাবার কাছ থেকে।

আমি যে সেই টাকার তাগাদা করতেই এসেছি—কথাটা বলতে কেমন যেন সংকোচ বোধ করেছিলাম। কিছু বলিনি। না বলেই চলে এসেছিলাম সেদিন।

চলে এসেছিলাম, কিন্তু আমার মন পড়ে ছিল ললিতার

কাছে। ক্রমাগত শুধু ললিতার কথাই ভেবেছিলাম। পৃথিবীর যাবতীয় দৃশ্য বস্তু যেন মুছে গিয়েছিল আমার চোখের সুমুখ থেকে। সব সময়েই দেখেছিলাম সেই অবনতমুখী সৌন্দর্য-প্রতিমা যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে আমার কাছে। পরিপূর্ণ আনন্দে ভরে গিয়েছিল আমার মন। কবিতা লিখতে জানলে বোধহয় কবিতা লিখতাম। ছবি আঁকতে জানলে হুবহু তার ছবিটি এঁকে ফেলতে পারতাম কাগজের ওপর।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঘুরে বেড়ালাম সারাটা দিন।

মনে আমার এত আনন্দ এলো কেমন করে কে জানে। কী এমন দেখেছি ললিতার মুখে—যা আমি অন্য মেয়ের মুখে দেখতে পাইনি? নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেছি বারংবার, কিন্তু কোনও জবাব খুঁজে পাইনি।

ভেবেছি হয়ত এ আমার যৌবনের উচ্ছ্বাস। হয়ত-বা একটি নারীসঙ্গ লাভের উদগ্র কামনা। হয়ত-বা এই বয়সে এমনিই হয়। হয়ত এ আমার বয়সের ধর্ম!

কিন্তু না, তা নয়। সুরেশের বোন বিনতাকে দেখেছি। সুরেশ আমার কলেজের সহপাঠী। তাদের বাড়ি যখনই গেছি, বিনতা হেসে হেসে এসে দাঁড়িয়েছে আমার কাছে। আই-এ-পড়া মার্জিতরুচি পরিচ্ছন্ন আধুনিকা। সাদা ধপ-ধপ করছে গায়ের রং। ললিতার চেয়ে কম সুন্দরী নয়।

তার পরে মালাবিকা। ওদের কারোর সঙ্গেই যেন ওর তুলনাই হয় না! ওদের পাওয়া সহজ, কিন্তু ওকে······?

কিন্তু তবু ওরা এমন করে আমার মনকে তো টানে-নি।

রাত্রে দাদা জিজ্ঞাসা করলে, গিয়েছিলি হরিবাবুর বাড়ি ?

বললাম, গিয়েছিলাম। দেখা পাইনি। কাল আবার যাব।

দাদা বললে, গিয়ে আর কি হবে ? পালিয়ে বেড়াচ্ছে লোকটা। যাক, আর যেতে হবে না।

দাদা বললে, যেতে হবে না। আমি কিন্তু তার পরের দিন আবার গেলাম হরিবাবুর সন্ধানে। না গেলে আমার যে চলবে না—দাদা বুঝবে কেমন করে ?

মনে মনে কামনা করলাম, হরিবাবুর সঙ্গে দেখা না হলেই যেন ভাল হয়।

তাই হলো।

হরিবাবুর নাম ধরে ডাকতেই ললিতা এসে দরজা খুলে দিলে।

জিজ্ঞাসা করলাম, আজও বেরিয়ে গেছেন ?

ললিতা বললে, হ্যাঁ।

বলেই কাকে দেখে সে যেন একটু আড়ালে সরে গেল।

পেছন ফিরে তাকালাম। দেখলাম কমবয়সী একটা ছেলে সেইদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার পেছনে।

মুখটা তার চেনা-চেনা মনে হলো। এই পাড়ারই ছেলে। জিজ্ঞাসা করলাম, কি চাই ?

অত্যন্ত অভদ্র ভাবে চোখ পাকিয়ে জবাব দিলে, কি চাই তা আপনার জানবার কি দরকার ?

বললাম, তা ওখানে এরকম করে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন ?

—বারে, দাঁড়িয়ে থাকবো না ? এইটে আমাদের বাড়ি তো !

—কোন্‌টা বাড়ি ?

বাঁদিকের একটা দরজা দেখিয়ে দিয়ে ছেলেটা বললে, এইটে।

বললাম, যাও বাড়ি যাও। এখানে কি দেখছো ?

ছেলেটা নড়লো না। নির্লজ্জের মত বললে, এই দেখছি !

বলেই সে ললিতা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেইদিকে তাকালে।

এমন করে কি দেখছে, কাকে দেখছে, আমি বুঝতে পেরেছিলাম। মনে হলো ছেলেটার গালে খিঁচে একটি চড় বসিয়ে দিই। কিন্তু ভরসা হলো না। আজকালকার ছেলে, চড় খেয়ে হয়ত কেঁদে-কেটে লোক জড়ো করে এমন সাধু সেজে বসবে যে আমিই হয়ত বিপদে পড়ে যাব।

ছেলেটা কিছুতেই যখন গেল না সেখান থেকে, তখন বাধ্য হয়ে অন্য পথ ধরলাম। ভাবলাম ভাল করে মিষ্টি

কথা বলে দেখা যাক। বললাম, তুমি এই হরিচরণবাবুকে চেনো ?

—খুব চিনি।

বললাম, তিনি বাড়িতে নেই। না ?

ছেলেটা বললে, কে জানে তা ! অনেক সময় বাড়িতে থেকেও বলে দেয়, নেই।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন ?

ছেলেটা বললে, পাওনাদারের ভয়ে।

বুঝলাম ছেলেটা কাঁচাতেই পেকে গেছে। ওর উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, শুধু আমারই মতো ললিতাকে দেখা। তাই ও এখানে অমন অভদ্রের মত দাঁড়িয়ে আছে।

ছেলেটাকে বললাম, দ্যাখো, আমি একজন পাওনাদার। খালি খালি আসছি আর ফিরে ফিরে যাচ্ছি। তোমার কি মনে হয়—হরিবাবু বাড়িতে আছে ?

—ললিতা কি বলে ?

—বলছে নেই।

ছেলেটা তখন আমাকে একটা ভাল পরামর্শ দিলে। গলাটা খাটো করে বললে, হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ুন না।

বললাম, ভদ্রলোকের বাড়ি, সেটা কি উচিত হবে ?

ছেলেটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে উঠলো, হুঁঃ ! ভদ্দর-লোক !

বলেই সে আমাকে আর-একটা উপদেশ দিলে। বললে, ললিতা যখন আপনার সঙ্গে কথা বলছে, তখন ওকে বলুন আপনার খুব পিপাসা পেয়েছে, এক গ্লাস জল চেয়ে

ওর পিছু পিছু ঢুকে পড়ুন। ভেতরে একখানা তো ঘর! সব দেখতে পাবেন।

—বাঃ! তোমার তো বেশ বুদ্ধি আছে। তা তুমি এক গ্লাস জল চেয়ে ভেতরটা দেখে এসে আমাকে খবরটা দাও না!

ছেলেটা বললে, ধেৎ! আমি কেন জল চাইতে যাব!

—তোমার সঙ্গে মেয়েটার বুঝি ঝগড়া আছে?

—ধেৎ! ঝগড়া কেন থাকতে যাবে! আমরা তো এক বাড়িতেই থাকি।

ললিতা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ সেই দিক থেকে কেমন যেন একটা শব্দ পেলাম। ফিরে তাকালাম সেই দিকে। দোরের আড়াল থেকে ললিতা বেরিয়ে এসে বললে, শুনুন!

কাছে যেতেই ললিতা বললে, আপনি কি বাবার সঙ্গে দেখা না করে যাবেন না?

বললাম, দেখা করে কোনও লাভ হবে?

ললিতা বললে, না। বাবা এখন টাকা দিতে পারবে না। কাল আমি বলেছিলাম আপনার কথা।

—কি বললেন উনি?

—দাঁড়ান, বলছি। বলেই সে বাইরের দিকে তাকালে। দেখলাম ছেলেটা আমার পিছু পিছু দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ললিতা বললে, আজ তুমি আবার অমনি করে দাঁড়িয়ে আছ?

ছেলেটা কি যেন বের করলে তার পকেট থেকে।

তার পর হাতের মুঠোর ভেতর লুকিয়ে হাত বাড়িয়ে বললে, নাও ধরো।

ললিতা বললে, না আমি নেবো না।

ছেলেটা আমার মুখের দিকে তাকালে। তার পর নির্লজ্জের মতন বললে, যান না মশাই, আপনি একটু সরে যান না ভেতরের দিকে। ললিতার সঙ্গে আমার একটা খুব গোপনীয় কথা আছে।

ললিতা বললে, না, উনি সরবেন না। তুমি কি বলবে ওঁর কাছেই বল।

ছেলেটা বললে, যদি না নাও তো তোমার পায়ে আমি মাথা খুঁড়ে রক্ত বের করে ফেলবো।

—বল আর কখনও আনবে না!

—পরের কথা পরে ভাববো, আজকে নাও তো!

—দাও। বলে ললিতা হাত পেতে নিলে তার সেই গোপন জিনিসটি। নিয়ে বললে, কাল থেকে আর অমন করে দাঁড়িয়ে থেকো না। আমি আবার তোমার মাকে বলে দেবো।

—মা আমার কচু করবে!

এই বলে সে হাসতে হাসতে চলে গেল।

ললিতা সদর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আমার দিকে তাকালে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি দিলে ছেলেটা?

ললিতা হাসলে। হাসলে মুক্তো ঝরে—এমনি একটা কথা রূপকথার গল্পে পড়েছিলাম। আজ যেন নিজের চোখে

দেখলাম। মুক্তো অবশ্য ঝরলো না, কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর সে হাসি। ললিতার বয়সী অনেক মেয়েকে আমি হাসতে দেখেছি। কিন্তু এ-হাসি যেন সে-সব থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এত মনোরম হাসি হাসতে আমি কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

হেসে তার হাতের মুঠি আমার চোখের সুমুখে খুলে ধরলে সে। দেখলাম, চানাচুরের একটি প্যাকেট।

তেমনি হাসতে হাসতেই বললে, খাবেন ?

বললাম, না।

ললিতা বললে, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা বলতে দেখলে ও আবার আসবে !

বললাম, ছেলেটা কি পাগল নাকি ?

ললিতা বললে, হ্যাঁ। টাইফয়েড হয়েছিল, তার পর থেকে অমনি হয়ে গেছে।

—কে বললে ?

ললিতা বললে, ওর মা।

আমি বললাম, না। টাইফয়েডের জন্যে পাগল হয়নি, ও পাগল হয়ে গেছে তোমাকে দেখে !

চট্ করে ললিতার মুখখানা অন্যরকম হয়ে গেল। চোখদুটি সে নীচের দিকে নামিয়ে নিলে। কথাটা বলা বোধহয় আমার উচিত হলো না।

কিন্তু কেমন করে কথাটা ফিরিয়ে নেবো, কী কথা বললে তার মুখের সেই চেহারা আবার ফিরে আসবে, বুঝতে পারলাম না। হাতের তীর আর মুখের

কথা একবার বেরিয়ে গেলে আর ফিরিয়ে আনা যায় না।

কিন্তু কথাটা তো আমি মিথ্যা বলিনি! আমারও অবস্থা হয়েছে ঠিক ওই ছেলেটার মত। আমাকেই-বা কে এখানে ধরে রেখেছে এমন করে? কাজ আমার শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। টাকা চাইতে এসেছি ললিতার বাবার কাছে। শুনেছি ললিতার বাবা বাড়ি নেই। বাস্, আমার কাজও শেষ হয়ে গেছে, কথাও ফুরিয়ে গেছে। তবু আমি নড়িনি এখান থেকে।

আমাকে ধরে রেখেছে ললিতা। ললিতার এই সর্বনাশা রূপ!

শুধু কি রূপ? তার আচার-ব্যবহার, চাল-চলন সবকিছুই। কথায় যে এত মিষ্টতা থাকতে পারে, তা তো আগে জানা ছিল না!

ললিতা আমাকেও পাগল করেছে। চলে যেতে ইচ্ছে করছে না সেখান থেকে। মনে হচ্ছে যেন ললিতার মুখের দিকে তাকিয়েই আমি যেন আমার সারা জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি।

কিন্তু সে সুযোগ আমি বোধহয় পাব না। আমি বলেছি—ছেলেটা পাগল হয়েছে তোমাকে দেখে। আমি তার রূপের প্রশংসাই করেছি। তাইতে ললিতার যদি রাগ হয়ে যায়, তাহলে আমার আর এখানে এমন করে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত নয়।

বললাম, বুঝেছি। আমি চললাম। আর আসব না।

এই বলে সত্যিই আমি চলে আসছিলাম সেখান ৫
ললিতা ছুটে একেবারে দোরের কাছে চলে এলো। দোরে
একটা কপাট ছিল খোলা। তাড়াতাড়ি সেই কপাটটা বন্ধ করে পিঠ দিয়ে দোরটা চেপে দাঁড়িয়ে পড়লো সে আমার চোখের সামনে। বললে, কি বুঝেছেন বলুন!

বললাম, বুঝেছি—তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে চাও।

ললিতা বললে, ওরে বাবা, কী মিথ্যুক!

বললাম, তাড়াতে চাওনি? তাহলে অমন সুন্দর মুখখানি অত ভারী হয়ে উঠলো কেন?

—কখন?

—যখন বললাম ছেলেটা তোমাকে দেখে পাগল হয়ে গেছে।

ললিতা বললে, হ্যাঁ, আমাকে দেখে! আমি কী?

বললাম, তুমি যে কী তা তুমি জানো না, আমি জানি। তুমি যেন মৃগনাভি! সকলকে পাগল করে বেড়ানই তোমার ধর্ম।

ললিতার চোখের দৃষ্টি আবার নীচে নেমে গেল।

বললাম, তোমাকে দেখে গিয়ে কাল সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি।

ললিতার চোখের পাতাদুটি আবার উঠলো। কৌতুকমিশ্রিত সে রহস্যময় চোখের ভাষা বুঝতে আমার দেরি হলো না। সমস্ত শরীর আমার আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। ললিতার ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা গেল। বললে, সারারাত ঘুমোননি, বাড়ি গিয়ে সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়ুন!

...লই সে ছুটে পালিয়ে গেল।

ফিরে তাকাতেই দেখি, ললিতা দোরের কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বললে, বাবাকে থাকতে বলবো। কাল আসবেন।

এ আবার কি রকম কথা ?

ললিতার কথাগুলো আমাকে যেন—চাবুক মারলে।—তার বাবাকে সে থাকতে বলবে ? সেই জন্যেই আমাকে আবার কাল আসতে বলছে !

তাহলে তার চোখের দৃষ্টিতে যে-ভাষা আমি পড়লাম, সে কি তবে অর্থহীন ? যে-কথা আমি শুনলাম সে কি হেঁয়ালী ?

প্রথম রাত্রে আমি ঘুমোতে পারিনি আনন্দের আতিশয্যে। দ্বিতীয় রাত্রি আমার বিনিদ্র কাটলো দুঃসহ বেদনায়।

সারাটা রাত আমি ছটফট করলাম ললিতাকে হারাবার আশঙ্কায়।

দাদার কোন্ এক বড়লোক মক্কেল একদিন এসেছিল আমার বিয়ের জন্যে। অনেক টাকা দিতে চেয়েছিল দাদাকে। মেয়েটি তেমন নাকি সুশ্রী নয়।

তাই না শুনে বৌদি বলেছিল, না। ভাই তোমার দেখতে শুনতে মন্দ নয়, তার ওপর লেখাপড়াও কিছু শিখেছে। যে-মেয়ে সুন্দরী নয় তার সঙ্গে ওর বিয়ে দিও না। টাকা থাকবে না, কিন্তু বৌটা থাকবে।

দাদা সে-বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছিল।

এবার ভেবেছিলাম, আমি নিজে বলবো বৌদিকে।—সুন্দরী একটি মেয়ের খোঁজ পেয়েছি বৌদি। আমার বিয়ে যদি দিতে হয় তো এরই সঙ্গে দাও।

বৌদি বলবে দাদাকে। দাদা বলবে ললিতার বাবাকে।

ললিতার বাবা গরিব। তক্ষুনি রাজী হয়ে যাবে।

কিন্তু সেদিন সব-কিছু আমার গোলমাল হয়ে গেল। ধূলিসাৎ হয়ে গেল ভবিষ্যতের কল্পনা।

ললিতা যদি আমার মনের কথা না বুঝতে পারে, ভাল যদি সে আমাকে না বাসে, তাহলে সে যত সুন্দরীই হোক, তাকে আমার জীবনের সঙ্গিনী করে কোনও লাভ নেই।

চোখে চোখে দেখাদেখি হবামাত্র ভাল লাগা, প্রেম, ভালবাসা—এই রকম কত কথা শিখে রেখেছিলাম, বিশ্বাস করেছিলাম, কিন্তু সে-বিশ্বাস আমার শিথিল হয়ে যেতে লাগলো। মনে হলো ও-সব শুধু কথার কথা। মানুষের মনের সান্ত্বনা। দেহের ক্ষুধাটাকে মানুষ বোধকরি এমনি সব বড় বড় কথা বলে চাপা দেবার চেষ্টা করেছে।

প্রথম দৃষ্টিতেই যাকে আমার এত ভাল লাগলো, যাকে না পেলে মনে হলো জীবন আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে, জানতাম তাকে নাকি সেকথা বলে বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন হয় না। মানুষের মন নাকি আপনা থেকেই সেকথা টের পায়। তারও আমাকে ঠিক তেমনিই ভাল লাগে।

কিন্তু আমার সে মনের জানা মনেই রইলো। জীবনে তা সত্য হলো না।

মন কিন্তু মানতে চাইলে না কিছুতেই।

যত ভাবি ললিতার কথা ভাববো না, মন যেন তত বেশী করে তারই কথা ভাবতে থাকে। তারই ছবিখানা চোখের সুমুখে বারংবার ভেসে ওঠে।

বলতে লজ্জা নেই, ললিতার জন্যে আমি সেদিন ছেলে-মানুষের মত কেঁদে ভাসালাম।

সকালে বৌদি ডাকলে, ঠাকুরপো, চা খাবে এসো।

নিজের চেহারা নিজে তো দেখতে পাচ্ছিলাম না। বৌদি আমাকে দেখেই বললে, এ কি মুখের চেহারা হয়েছে তোমার? রাত জেগে নভেল-টভেল পড়েছ নাকি?

বললাম, না। ভাল ঘুম হয়নি রাত্রে।

—চান-টান করে সকাল-সকাল খেয়ে ঘুমোওগে যাও।

—হ্যাঁ তাই করি। বলে চলে এলাম নিজের ঘরে।

আবার লড়াই আরম্ভ হলো নিজের মনের সঙ্গে।

ললিতা বলেছিল, বাবাকে থাকতে বলবো। আপনি আসবেন।

গেলে দেখা হয় ললিতার সঙ্গে। ললিতাকে একটিবার দেখবার জন্যে মন আমার ছটফট করতে লাগলো। কিন্তু কি জন্যে যাব? তার বাবার কাছে টাকার তাগাদা করতে?

ছি ছি, ললিতা আমাকে ভেবেছে কি ?

এত বড় অপমান সে আমাকে করলে কেমন করে ?

কিছুতেই গেলাম না। জোর করে বসে রইলাম নিজের ঘরে।

বই পড়বার চেষ্টা করলাম। মন বসলো না।

স্নান করলাম। খেলাম। ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। চোখে ঘুম কিছুতেই এলো না। সেই এক কথা। সেই এক চিন্তা। ললিতা আর ললিতা। এমনটি তো কারোর জন্যে হয়নি ? মন যেন আমাকে গিলে খেতে চায়।

বেরিয়ে গেলাম বাড়ি থেকে। রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

ডানদিকে ললিতাদের বাড়ি। বাঁ দিকে চলতে লাগলাম। ললিতার কথা ভাবতে ভাবতে চায়ের দোকানে গিয়ে বসলাম। চা খাবার সময় তখনও ঠিক হয়নি। দোকানে লোকজনের ভিড় একরকম নেই বললেই হয়।

দোকানদার জিজ্ঞাসা করলে, এত সকাল সকাল ? কোথাও যাবে নাকি ?

—না। এক কাপ চা দাও।

চুপ করে বসে রইলাম। কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। আর কথাই-বা আমার আছে কি ? আছে মাত্র একটি কথা। যা ইচ্ছে করে বলতে কিন্তু বলা যায় না।

ইচ্ছে করে, প্রতিটি মানুষকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করি, কাউকে সে ভালবেসেছে কিনা। আর ভালবেসে আমার মতন জ্বলে পুড়ে মরছে কি না !

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে ভাবলাম, সিনেমায় গিয়ে ছবি দেখি। কিছুক্ষণের জন্য হয়ত ভুলে থাকতে পারবো।

টিকিট কিনে সিনেমায় ঢুকলাম। কত মেয়ে এসেছে ছবি দেখতে। নানান বয়সী নানারকমের সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু কারও মুখের দিকে সেদিন আর আমি তাকাতে পারলাম না। সবাইকে আড়াল করে আমার চোখের সুমুখে এসে দাঁড়ালো ললিতা। নিতান্ত কমদামী সাদাসিধে সেই শাড়ি, কাঁধের কাছটা ছেঁড়া, হাতে কাঁচের চুড়ি, তবু মনে হলো যেন তার মত সুন্দরী এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কেউ নেই। সেই অপরূপা সৌন্দর্যপ্রতিমা, সেই ভুবনমনমোহিনী নিষ্ঠুরা ললিতা !

এমন কি সিনেমার পর্দার ওপর প্রতিফলিত অমন যে বিখ্যাত নায়িকা, যার জন্যে দেশের কত ছেলেমেয়ে পাগল, তাকেও যেন অত্যন্ত কুৎসিত বলে মনে হল। আমার চোখে কেবল ললিতার ছবি, সেকথা আগেই বলেছি।

সিনেমার ছবিতে মন বসলো না। পর্দার ওপর ছবির পর ছবি চলে যেতে লাগলো, আর আমার মনের পর্দায় অনড় অচল হয়ে বসে রইলো ললিতার মুখখানি।

একটি মুহূর্তের জন্যও ললিতা আমাকে পরিত্যাগ করলে না।

না না, মিথ্যা কথা। ললিতা আমাকে পরিত্যাগ করেছে। আমিই তাকে পরিত্যাগ করলাম না।

এ আমারই মোহ। এর থেকে আমি মুক্তি চাই।

কিন্তু কী সর্বনাশা বন্ধন।

তিনটি দিন দিবারাত্রি আমি তারই কথা ভেবেছি আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি—এ চিন্তা থেকে আমাকে মুক্তি দাও। মনের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করেছি। মনকে বুঝিয়েছি—এ আমার ভ্রম, এ আমার ভ্রান্তি, আমার দুর্বলতা।

বাড়ি থেকে যখনই বেরিয়েছি, রাস্তায় পা দিয়েই ভেবেছি—ডানদিকে তাকাব না। ললিতাদের বাড়ি যে-পথে, সে-পথে হাঁটবো না। চলেও গেছি অন্য দিকে। আবার শেষ পর্যন্ত ফিরে এসেছি। রাত্রির অন্ধকারে—লোকচক্ষুর অন্তরালে তাদেরই বাড়ির সুমুখের পথ দিয়ে বারংবার ঘোরাফেরা করেছি।

তিনটে দিন কোনোরকমে কেটে গেল।

চারদিনের দিন দুপুরে কী জানি কেন, হঠাৎ মনে হলো রাত্রির অন্ধকারে কেন যাব? যেতে হয়, যাব দিনের আলোয়। আমি তো অন্যায় কিছু করছি না। আমি অপরাধী নই।

কিসের আশায় জানি না, সত্যিই চলে গেলাম ওদের রাস্তায়। গলিটা বেঁকে গেছে ললিতাদের বাড়ির পাশ দিয়ে। ঢুকলাম সেই গলির ভেতর। ললিতাদের বাড়ির

দিকে একবার মাত্র তাকিয়েছিলাম। বাড়িতে অনেকগুলো ভাড়াটে। তবু দেখলাম, সদর দরজাটা বন্ধ।

রাস্তা ধরে অনেকখানি চলে গেছি। আবার ফিরবো কিনা ভাবছি, এমন সময় মনে হলো পেছন থেকে কে যেন ডাকলে, শুনুন!

তাকালাম সেই দিকে। দেখি সেই ছেলেটি ছুটতে ছুটতে আসছে আমার দিকে এগিয়ে।

এসেই থমকে থামলো আমার সামনে। জিজ্ঞাসা করলে, আপনার নাম কি?

—কেন, আমার নাম জেনে কি হবে তোমার?

—আরে বলুন না! আপনি তো ওই উকিলবাবুর ভাই?

—হ্যাঁ।

ছেলেটি বললে, আমাকে চিনতে পেরেছেন?

বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনেছি। সেই তো দেখেছিলাম ললিতাদের বাড়িতে।

—বলুন তো আমার নাম কি?

—তোমার নাম আমি কেমন করে জানবো?

ছেলেটি বললে, আমার নাম—রামু। শ্রীরামচন্দ্র বসাক। এইবার বলুন আপনার নাম।

বললাম, আমার নাম জেনে কি হবে বল আগে।

—তাহলে বলবেন?

—হ্যাঁ।

ছেলেটি বললে, বলতে হবে একজনকে।

—কাকে ?

ছেলেটি হেসে বললে, ললিতাদিকে।

—কেন ? ওর বাবা বুঝি জিজ্ঞাসা করেছে ?

ছেলেটি বললে, তা জানি না।

জিজ্ঞাসা করলাম, ললিতাকে তুমি দিদি বল নাকি ?

—ওরে ব্বাবা ! দিদি না বললে আর রক্ষে আছে ! আপনিই তো এই কাণ্ডটি করলেন। সেদিন কী যে বলে এলেন ললিতাদিকে, ললিতাদি আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিলে। চানাচুর দিতে গেলাম, হাতে করে নিলে, নিয়ে চারপয়সার এক প্যাকেট চানাচুর নরদমায় দিলে ফেলে। মাকে কী সব বলে দিয়ে আমাকে গাঁট্টা খাওয়ালে। মা বলে দিয়েছে—ললিতাকে যদি আমি দিদি না বলি, মা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে।

বললাম, না না আমি কিছু বলিনি তো!

রামু বললে, বারে, আমি বুঝি কচি খোকা ! আমি জিজ্ঞাসা করিনি ভেবেছেন ?

—ললিতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে ?

—হ্যাঁ।

—কি বললে সে ?

—বললে, চুপি চুপি আপনাকে ডেকে আনতে।

—ডাকতে তুমি গেলে না কেন ?

রামু বললে, গেলাম না বলেই তো হলো রাগ ! সেই রাগেই তো দিলে মাকে কি-সব যাতা লাগিয়ে !

—তার পর ?

—তার পর আর কি ! ললিতাদি একদম চুপ ! আমার সঙ্গে কথাবার্তা একদম বন্ধ। ডাকলে সাড়া দেয় না, কাছে গেলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারপর ওই যে বললাম, চানাচুরের প্যাকেটটা দিলে নরদমায় ফেলে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর আমার নামটা সে জানতে চাইলে কখন ?

—সে তো এই আজ সকালে। ললিতাদির বাবা সকাল-সকাল খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে গেল। আমি দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ললিতাদি এসেছিল দোরটা বন্ধ করতে। আমাকে দেখতে পেয়ে ডাকলে। বললে, খুব ছেলে তুমি ! একটা কাজ বললে যদি শোনো ! বললাম, বারে সকাল-বেলা তোমার বাবা দশটা পয়সা দিলে, চিংড়ি মাছ এনে দিলাম না বাজার থেকে ! ললিতাদি বললে, ও-রকম পচা-পচা চিংড়ি মাছ না আনলেই পারতে। তখন বললাম, তুমি আমাকে ডেকে বললে না কেন ? আবার এনে দিতাম। তখন উঠলো আপনার কথা। ললিতাদি বললে, খুব হয়েছে ! তুমি আমার কথা শোনো ? বাবা বলেছিল মাছ আনতে, তাই এনেছ। আমি যে তোমাকে বলেছি একটা কাজ করতে, সে-কাজ করেছ ? বুঝলেন ইয়ে-বাবু, কাজটা কি—বুঝলেন তো ? আপনাকে ডেকে আনতে বলেছিল, আমি আনিনি। তার পর বললে, তাকে ডেকে আনতে না পার, তার নামটা কি সেটাও তো জেনে আসতে পার ! বাস্, এই তো ব্যাপার ! শুনলেন তো ? এইবার

বলুন ইয়ে-বাবু, আপনার নামটা বলুন, আমি চট্ করে জানিয়ে দিয়ে আসি ললিতাদিকে।

বললাম, শুধু নামটাই জানিয়ে দিয়ে আসবে? আমি যদি নিজেই যাই—তাতেই-বা দোষ কি?

কথাটা শুনে রামুর সব উৎসাহ যেন দমে গেল। কেমন যেন ইতস্ততঃ করে বললে, না দোষ কিছু নেই। তবে কিনা এখন তো ললিতাদির বাবা বাড়িতে নেই। এখন হয়ত সে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। তার চেয়ে আপনার নামটা এখন জানিয়ে দিয়ে আসি, আপনি বরং কাল সকালে আসবেন।

বুঝলাম তার ললিতাদিদির কাছে আমাকে নিয়ে যাবার ইচ্ছে নেই রামুর। বললাম, না রামু, কাল আমার সময় হবে না। আজই আমি যাব তোমার ললিতাদির কাছে। এক্ষুনি যাব।

আমার আগ্রহ দেখে রামু একটুখানি বিপদে পড়ে গেল। নেহাত দায়ে পড়ে বললে, চলুন তাহলে যাই আপনার সঙ্গে।

হেসে বললাম, না না, তুমি ভুল বলছো রামু। তুমি আমার সঙ্গে যাবে না, আমিই বরং যাবো তোমার সঙ্গে। তোমার ললিতাদিদিকে গিয়ে বলবো—রামু আমাকে ধরে নিয়ে এলো।

রামু কিন্তু সেকথার কোনও জবাব দিলে না।

দোরের কাছাকাছি গিয়ে দেখা গেল—এজমালি সদরটা খোলা, কিন্তু ললিতাদের ঘরে যাবার ভেতরের দোরটা বন্ধ।

রামু তাড়াতাড়ি ছুটে গেল দোরের কাছে। কড়া নেড়ে ডাকলে, ললিতাদি!

ভেতর থেকে কোনও সাড়া নেই।

রামু আবার ডাকলে।

এবারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

রামুর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললাম, জোরে জোরে ডাকো।

রামুও তেমনি চুপি চুপি জবাব দিলে, মা শুনতে পেলে বকবে।

আরও বারকতক কড়া নাড়লে রামু। দরজা কিন্তু খুললো না।

রামু বললে, ঘুমিয়ে পড়েছে। আপনি ডাকুন।

ডাকতে হলো বাধ্য হয়ে। ডাকলাম, ললিতা!

দোরের পেছনে মনে হলো কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। আওয়াজ হলো। আবার ডাকলাম, ললিতা!

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। রামু বললে, আচ্ছা ঘুম তোমার ললিতাদি। দ্যাখো কাকে ধরে এনেছি।

ললিতা বললে, কে বলেছিল ধরে আনতে?

—বারে, তুমিই তো বললে!

বলেই সে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, কই, নাম তো বললেন না? ললিতাদি আপনার নামটাও জানতে চেয়েছিল।

লজ্জায় ললিতার মুখখানা কেমন যেন হয়ে গেল।

বললাম, নাম কি হবে, আমি নিজেই তো এসেছি।

ললিতা রামুর কাছে গিয়ে বললে, তুমি এখন যাও, ওঁর সঙ্গে আমার কথা আছে।

—চানাচুর আনবো তো ?

—এনো। বলেই সে দোরের খিলটা বন্ধ করতে গিয়েও আর করলে না। তাড়াতাড়ি আমার আগেই ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকলো।

আমিও গেলাম তার পিছু পিছু।

গিয়ে দেখি, ঘরের একটা জানলার সিক ধরে ললিতা পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে।

কাছে গিয়ে ডাকলাম, ললিতা !

ললিতা সাড়াও দিলে না, আমার দিকে ফিরেও তাকালে না।

বললাম, ললিতা, তুমি আমাকে ডেকেছিলে ?

ললিতা চুপ করে রইলো।

বললাম, আমার নাম জানতে চেয়েছিলে ?

ললিতা তবু কথা বলে না !

—আমার নাম সমর। সমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ! আর কিছু জানতে চাও ? কথা বল ললিতা ! চুপ করে রইলে কেন ?

কিছুতেই যখন তাকে কথা বলাতে পারলাম না, তখন একবার মনে হলো দু-হাত দিয়ে ধরে তার মুখখানি নিজের দিকে ফিরিয়ে নিই, কিন্তু পারলাম না তার গায়ে হাত দিতে।

বললাম, বেশ, তাহলে আমি চলে যাই !—যাব ?

—না। বলে ললিতা মুখ ফেরালে আমার দিকে।

সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি! যে-মুখখানি আমি অনেকক্ষণ দেখিনি।

প্রাণ ভরে সেই মুখখানি দেখবার জন্যে যেই সেদিকে ভাল করে তাকিয়েছি, দেখি—মিনতিকাতর সে দুটি বড় বড় চোখ জলে ভরে এসেছে।

নিজেরও অজান্তে কখন্ যে আমার দুটি হাত তার কাঁধে রেখেছি আমি বুঝতেই পারিনি। বললাম, তুমি কাঁদছো ললিতা?

সেকথার কোনও জবাব সে দিলে না। ধীরে ধীরে তার মাথাটি আমার বুকের ওপর রেখে বললে, ডেকে না পাঠালে তুমি তো আসতে না!

কি বলবো ললিতাকে? আমি কেমন করে বোঝাবো যে, এখানে আসবার জন্যে কী প্রাণান্তকর বেদনায় আমি দিবারাত্রি ছটফট করেছি!

বললাম, তুমি বলেছিলে তোমার বাবার কাছে আসতে। তোমার কাছে আসতে তো বলনি!

তেমনি বুকের ওপর মাথা রেখে চোখ তুলে তাকিয়ে ললিতা হাসলে।

তার চোখের জল তখনও শুকোয়নি। অশ্রুভারাক্রান্ত চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। আশ্চর্য সুন্দর দুটি ঠোঁটের ফাঁকে মুক্তোর মত দাঁতের সারি দেখা গেল। সে হাসির অর্থ—বাবার নাম করে মিথ্যা ছলনা করে তোমায় আসতে বলেছিলাম, সেটুকুও তুমি বোঝ না? তুমি এত বোকা?

এতক্ষণে ললিতাকে যেন আমি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারলাম। দুহাত দিয়ে জড়িয়ে তাকে বুকের ওপর চেপে ধরলাম। বললাম, দুষ্টু!

ললিতার চোখের পাতা নেমে এলো। লজ্জায় সে আমার বুকের ওপর মুখটা লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করলে।

নারীর স্পর্শ পুরুষের মনকে যে এমন করে মাতাল করে, তা তো জানতাম না! একটি অনির্বচনীয় আনন্দ আমার সারা দেহ মনকে যেন পুলকে ভরিয়ে তুললো। প্রায় মিনিট দুয়েকের ওপর গেল নিজেকে সংযত করতে। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করে ডাকলাম ললিতাকে।

—ললিতা!

মুখ না তুলেই ললিতা বললে, উ।

—প্রথম যখন তোমাকে আমি দেখলাম ললিতা, মনে হলো তুমি যেন আমার কতকালের চেনা। মনে হলো তোমাকেই যেন আমি খুঁজছিলাম।

কথার মাঝখানে ললিতা মুখ তুলে তাকালে।

কথা শেষ হতেই বললে, একা তোমারই মনে হয়েছিল? আর কারও কিছু হয়নি?

এর পর আর আমি নিজেকে সংবরণ করতে পারলাম না। অনাঘ্রাত পুষ্পের মত ললিতার সেই পবিত্র সুন্দর মুখখানি তুলে ধরে আমার অন্তরাত্মার পরিপূর্ণ তৃপ্তির স্বাক্ষর এঁকে দিলাম তার সেই আশ্চর্য সুন্দর দুটি ওষ্ঠপ্রান্তে।

অমৃতের আস্বাদ কেমন তা আমি জানি না। ভগবানকে পাওয়ার আনন্দের অনুভূতি কল্পনাতীত। নশ্বর দেহধারী এই মর্ত্যের মানুষ আমি, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের এই পরমলগ্নে অনাস্বাদিতপূর্ব যে-আনন্দের অনুভূতিতে আমার সর্বদেহমন পরিপ্লাবিত হয়ে গেল, মনে হলো এও যেন তেমনি একটি অপার্থিব বস্তু। এ যেন আমার এক দুর্লভ সৌভাগ্য।

এই আনন্দশক্তির প্রভাব যে এত অসামান্য হতে পারে তাও আমার জানা ছিল না। যে পৃথিবীতে এতক্ষণ আমি বাস করছিলাম, মুহূর্তের মধ্যে সে-পৃথিবী যেন অন্য পৃথিবী হয়ে গেল। তার রূপ রং সবই গেল বদলে। সবই যেন অপরূপ, সবই যেন সুন্দর। এখানে দুঃখ নেই, দৈন্য নেই, ভয় নেই, মৃত্যু নেই।

সেই দিন থেকে ললিতা হলো আমার জপমন্ত্র!

ললিতাকে না দেখে থাকতে পারি না। রোজই যাই তাদের বাড়ি। যাই সেই সময়—যখন তার বাবা থাকে না। হরিবাবু রোজই বেরিয়ে যান সকালে যাহোক চারটি মুখে দিয়ে। ফিরে আসেন রাত্রে।

সারাদিন তিনি বাইরে বাইরে কাটান বোধকরি পাওনাদারের ভয়ে। কত লোকের কাছে কত টাকা যে ধার করেছেন তার আর ইয়ত্তা নেই। আমি নিজেই কত লোককে তাড়িয়েছি।

কড়া নাড়লে ললিতা বলতো, দরজা খুলো না! ও নির্ঘাত্ পাওনাদার।

বলতাম, পাওনাদার না হয়ে যদি তোমার বাবা হন?

—বাবা আমার নাম ধরে ডাকবে।

এক-একদিন বলতাম, আচ্ছা ললিতা, এই সময় সত্যিই যদি তোমার বাবা কোনোদিন এসে পড়েন, কি হবে বলতে পারো?

ললিতা বলতো, কি হবে তা তুমিই জানো।

আমি বলতাম, আমি অন্যায় কিছু করিনি। কাজেই ভয় আমি করব না। আচ্ছা তুমিই বল—

—কিচ্ছু জানি না আমি। বলে হাসতে হাসতে ললিতা সরে যেতো আমার কাছ থেকে।

—আমাকে যদি কিছু বলেন তো বলবো, আমি ভালবাসি ললিতাকে।

—আর ললিতা যদি তোমাকে ভাল না বাসে?

—ললিতাকে খুন করে ফেলবো।

—যদি না পারো খুন করতে?

—নিজে আত্মহত্যা করবো।

—ছি ছি ছি, আত্মহত্যা? একটা মেয়ের জন্যে?

—না, একটি মেয়ের ভালবাসার জন্যে।

ললিতা একদিন বললে, আচ্ছা ধর, তোমার দাদা যদি বলেন, ও-মেয়েটার সঙ্গে আমার ভাইএর বিয়ে আমি দেবো না?

—কেন দেবে না ?

—আমরা যে গরিব।

—ভালবাসা গরিব বড়লোক মানে না। আমি বলবো দাদাকে। দাদা যদি না শোনে তো আমি পালিয়ে যাব তোমাকে নিয়ে। যাবে তো ?

ললিতা বললে, এক্ষুনি যাবে ? চল, আমি তৈরী।

বললাম, দাদা আমার তেমন লোকই নয়। মনে হয়, তাঁকে বললেই তিনি রাজী হয়ে যাবেন। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি কালই বলবো বৌদিকে।

কিন্তু বৌদিকে বলবার আগেই—

সেদিন ছিল রবিবার। দাদার আদালত বন্ধ। মাংসের চপ তৈরি করছিল বৌদি। খেতে আমাদের দেরি হলো। চারটে চপ একটা কাগজে মুড়ে নিয়ে ললিতার কাছে গিয়ে বললাম, আগে তুমি খাও, তারপর অন্য কথা।

কিন্তু কিছুতেই খেলে না।

খেলে না বোধকরি লজ্জায়।

কাগজের মোড়কটা একটা বাটি চাপা দিয়ে রেখে ললিতা বললে, থাক্, পরে খাবো। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, বৌদি বলেনি কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছ ?

বললাম, বৌদি দেখতে পায়নি।

—তাহলে বল, চুরি করে এনেছ ?

বললাম, না। নিজে খাব বলে বৌদির কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলাম।

—নিজে না খেয়ে নিয়ে এসেছ আমা.. শুধু যে ছেঁড়া সেই চপ খাব আমি ? [illegible]লের দিন

এই বলে বাটির ঢাকা খুলে দুটো চপ এনে [illegible]ঙের আমার মুখের কাছে ধরলে। বললে, তোমাকে খেতেই হবে।

বললাম, এই মাত্তর আমি খেয়ে এসেছি।

—কিছুতেই শুনবো না। একটা অন্তত খেতেই হবে।

জোর করে একটা চপ সে আমার মুখে পুরে দিলে। আমিও একটা চপ তার হাত থেকে নিয়ে—দিলাম তাকে খাইয়ে।

দু'জনেই মনের আনন্দে হেসে হেসে চপ খাচ্ছি, এমন সময় বাইরে দোরের কাছে মনে হলো রামু কাকে যেন কি বলছে।

দোরটা ছিল খোলা।

ললিতা বললে, এই রে ! এসেছে !

বলেই সেইখান থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখতে গিয়ে তার মুখখানা হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মুখের চপটা তাড়াতাড়ি গিলে ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বললে, বাবা।

হরিবাবু দোরের কাছে এসে দাঁড়ালেন। ডাকলেন, ললিতা ! কে রয়েছে ঘরে ?

আমি বেরিয়ে গেলাম। ললিতা জবাব দেবার আগেই বললাম, আমি। আমি অমর উকিলের ভাই।

রামু বললে, দেখুন সত্যি কিনা। আমি চললাম।

রামু একবার তীব্র দৃষ্টিতে আমার মুখের
—কেন
ফয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। যার অর্থ, এইবারে
াতে ধরিয়ে দিয়েছি। কর প্রেম ললিতার সঙ্গে!
ভবেছিলে যে, কেউ জানতে পারবে না, কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। আমি ললিতার সঙ্গে তোমায় প্রেম করতে দেব না।

হরিবাবু কোনোদিন এসময় বাড়ি ফেরেন না। এতক্ষণে বুঝলাম তাঁর এই অসময়ে আবির্ভাবের হেতু। আমার ওপর রাগ করে রামুই তাঁকে ডেকে এনেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, হরিবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে এমন ভাবখানা দেখালেন—যেন তিনি আমাকে চেনেন না।

ললিতা বললে, সেই যে তোমাকে বলেছিলাম, অমরবাবুর সেই টাকার জন্যে উনি বার বার আসেন আর তোমার দেখা না পেয়ে ফিরে ফিরে যান।

হরিবাবু চিৎকার করে উঠলেন, তুই থাম!

ললিতা তার বাবাকে চেনে। ভয়ে সে কাঠ হয়ে গেল।

হরিবাবু বলেন, তোমার নাম সমর। না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঘরের সামনে একফালি ঢাকা বারান্দা। ভাঙা একটা মোড়া পড়ে ছিল সেই খানে। সেইটার ওপর বসে পড়লেন হরিবাবু। বললেন, টাকা আমি এখন দিতে পারবো না। তোমার দাদাকে বোলো।

বললাম, বলবো।

হরিবাবু তাঁর গায়ের শার্টটা খুলে ফেললেন। ভেতরে

শতচ্ছিন্ন গেঞ্জিটা বেরিয়ে পড়লো। সেটা শুধু যে ছেঁড়া তা নয়, মনে হলো যেন এই গেঞ্জি পরে দোলের দিন তিনি হোলি খেলেছেন। সারা গেঞ্জিতে নানারকম রঙের ছাপ পাকা হয়ে বসে গেছে।

জামার পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করলেন হরিবাবু। দেশলাই জ্বেলে ধরালেন সেটা। খানিকটা ধোঁয়া বের করলেন মুখ দিয়ে।

আমি কি করবো বুঝতে পারছি না। হরিবাবুর যা বলবার তা তো তিনি বলেই ফেলেছেন। টাকা এখন তিনি দিতে পারবেন না। বাস্, ফুরিয়ে গেল আমার সঙ্গে তাঁর প্রয়োজন।

কিন্তু আমার প্রয়োজন তখনও ফুরোয়নি। ললিতা সম্বন্ধে একটা কথা তাঁর সঙ্গে কয়ে রাখা ভাল। আমি ললিতাকে ভালবাসি, তাকে আমি বিয়ে করতে চাই—কথাটা কেমন করে বলবো তাই ভাবছি। শুনলে নিশ্চয়ই তিনি খুশী হবেন। মেয়ে তাঁর বিবাহযোগ্যা। মনের মত একটি পাত্র তিনি নিশ্চয়ই খুঁজছেন। আমার মত পাত্র পাবেন—হয়ত-বা সে কল্পনাও তিনি করেননি কোনোদিন।

এমনি সব কত কথাই ভাবছি। ভাবছি, কথাটা এখন বলবো না। আর-একদিন এসে বলবো। এমন সময় হরিবাবু বললেন, ছাখো সমর, তোমাকে আমি জেলে দিতে পারি তা জানো?

অবাক্ হয়ে গেলাম হরিবাবুর কথা শুনে। ভুল শুনছি না তো? জিজ্ঞাসা করলাম, কি বললেন?

হরিবাবুর গলার আওয়াজ আর-একটু চড়লো। বললেন, তোমাকে আমি জেলে দিতে পারি।

—জেলে দিতে পারেন ? কেন ?

হরিবাবু বললেন, কেন, তুমি বুঝতে পারছো না ? কচি খোকা !

—আজ্ঞে না।

—বুঝতে চাও ?

বললাম, বলুন।

হরিবাবু বললেন, ওদের ওই ছেলেটা—ওই রামু, আজ কয়েকদিন থেকেই বলছে—তুমি নাকি রোজ আমার বাড়িতে আসা-যাওয়া কর। আমি ভেবেছিলাম তোমার দাদার সেই পঞ্চাশটা টাকার জন্যে আসছো, তাই তার কথাটাকে আমি গ্রাহ্যই করিনি। কিন্তু আজ সে বললে অন্য কথা। কথাটা তেমন ভাল নয়। যাকগে, তাই নিয়ে আমি কেলেঙ্কারি করতে চাই না। তুমি চট্ করে আমার একটা উপকার করে ফ্যালো। আমি তাহলে চেপে যাই ব্যাপারটা।

তাঁর কথা বলবার ধরনটা বেশ বাঁকা-বাঁকা। ভাল লাগলো না কথাগুলো। তবু জিজ্ঞাসা করলাম, কী উপকার করতে হবে বলুন।

হরিবাবু বললেন, যেমন করে পারো, একটি হাজার টাকা তোমাকে এনে দিতে হবে এক্ষুনি।

অবাক্ হয়ে গেলাম কথাটা শুনে। কিছুক্ষণ চুপ করে আমাকে ভাবতে হলো। ভেবে বললাম, যদি না পারি আনতে ?

—পারবে, পারবে, নিশ্চয়ই পারবে। হরিবাবু বললেন, তোমার দাদার মেলা টাকা। তোমার বৌদির হাতেও অনেককিছু আছে।

বললাম, আছে জানি। কিন্তু তারা দেবে কেন?

—দেবে তোমাকে বাঁচাতে।

বললাম, আমি কী এমন অন্যায় করেছি যে আমাকে বাঁচাতে যাবে তারা?

হরিবাবু কটমট করে আমার দিকে তাকালেন। চোখ রাঙিয়ে বললেন, অন্যায় করনি?

বুঝলাম তিনি কি বলতে চান। বললাম, না। আপনি জিজ্ঞাসা করুন আপনার মেয়েকে।

—ও! তাহলে অনেকদূর গড়িয়েছে।

এই বলে হরিবাবু তাকালেন একবার ঘরের দিকে। বোধকরি দেখতে চাইলেন ললিতাকে। কিন্তু ললিতা এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল যেখান থেকে হরিবাবু তাকে দেখতে পেলেন না, অথচ আমি তাকে দেখতে পেলাম। এমন সুন্দর মুখখানি তার ম্লান হয়ে গেছে। বড় বড় চোখ দুটি জলে ভরে এসেছে।

হরিবাবু বললেন, আমার মেয়েকে আমি জানি। ওকে আমি যা বলবো তাই করবে। টাকাটা তুমি চট্ করে নিয়ে এসো, যাও। নগদ টাকা একসঙ্গে সবটা যদি না পাও, আপাতত ভারী দেখে দু'একটা সোনার গয়না নিয়ে এলেও আমি ম্যানেজ করে নিতে পারবো। বাকী টাকা কাল দিও।

হরিবাবুকে আর বেশী কিছু বলবার অবসর দিলাম না। বললাম, শুনুন। মেয়ের আপনি বিয়ে দেবেন তো?

—সে-সব কথা পরে ভাববো।

বললাম, পরে ভাববার দরকার নেই। ললিতাকে আমি বিয়ে করবো।

হরিবাবু বললেন, জানি।

বললাম, তখন আর আপনাকে টাকার ভাবনা ভাবতে হবে না। আমি নিজেই সব ব্যবস্থা করবো।

হরিবাবু বিরক্ত হলেন। বললেন, আপাতত এই টাকার ব্যবস্থাটা কর। আজেবাজে কথা রাখো।

—আজেবাজে কথা নয়। আমি সত্যি বলছি।

নিবে-যাওয়া বিড়িটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হরিবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।—আমাকে কচি ছেলে পেয়েছ? ওই সব কথা বলে আমাকে ভুলিয়ে রাখতে চাও? ভালোবাসা-টালোবাসা প্রেম-ফ্রেম না ঘেঁচু! ও-সব কথা নাটকে-নভেলে লেখা থাকে। প্রথম প্রথম অমনি সব বড় বড় কথা সবাই বলে। আসল ব্যাপারটা হলো গিয়ে—যাকগে, তুমি টাকা আনবে কিনা বল।

জুলুম করে তিনি টাকা আদায় করতে চান আমাকে ভয় দেখিয়ে। বললাম, টাকা পাওয়া অত সহজ নয়।

নিতান্ত অভদ্রের মত হরিবাবু বললেন, আমার মেয়েকে পাওয়া খুব সহজ, না?

—ছি ছি ছি ছি! এ-কথা আপনি বলছেন কেমন করে?

হরিবাবু বললেন, আমার দোষ হলো? টাকা তুমি তাহলে দেবে না?

—আজ্ঞে না। আপনার এ-প্রস্তাবে আমি রাজী নই। তবে আপনার মেয়েকে বিয়ে আমি করতে পারি, আর বিয়ের পর আপনাদের দুজনের সমস্ত ভার আমি নিতে রাজী আছি।

—হুঁ, বুঝতে পেরেছি। বলেই হরিবাবু উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের ভেতর গিয়ে ডাকলেন, ললিতা!

দোরের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল ললিতা। যে-সব কথা তিনি তাকে বললেন, সবই আমি শুনলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। কোনও বাপ যে মেয়েকে সেকথা বলতে পারে তা আমার জানা ছিল না। লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল।

জবাবে ললিতা একটি কথাও বললে না। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো শুধু।

মেয়েকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হরিবাবুর মাথায় বোধকরি রক্ত উঠে গেল। বললেন, বলবি না? শুনবি না আমার কথা? আমি নিজে তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব ওর দাদা-বৌদির কাছে। তোকে কিছু বলতে হবে না। যা বলবার আমি বলবো। তুই শুধু "হুঁ-হাঁ" বলে যাবি।

এতক্ষণ পরে ললিতা কথা বললে। বললে, এত বড় মিছে কথাটা আমি বলবো কেমন করে বাবা?

—মিছে কথা হলো? দিনের পর দিন ওই ছোঁড়াটা

এসেছে তোর কাছে, সারাদিন একসঙ্গে কাটিয়েছিস, আর এখন বলছিস মিছে কথা? ও এমনিই বলছে বিয়ে করবো? নাঃ, নিজের ছেলেই বল আর মেয়েই বল, কেউ আপনার নয়। সব শয়তান, সব শয়তান!

বলতে বলতে চৌকাঠের বাইরে বেরিয়ে এলেন হরিবাবু। আমার কাছে এসে বললেন, মেয়েরা এ-সব কথা লজ্জায় বলবে না তা আমি জানি। কিন্তু তুমি সাবধান, তোমাকে আমি ছাড়বো না সহজে।

বললাম, আমার সাবধান হবার কিছু নেই। আমি অন্যায় কিছু করিনি।

হরিবাবু চিৎকার করে উঠলেন, এখনও তুমি এই কথা বলছো রাসকেল?

কথাটা শুনে আমার আপাদমস্তক জ্বলে গেল। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, আপনি ললিতার বাবা, তাই এখনও আমি আপনার সম্মান রেখে কথা বলছি। আপনি খুব ভুল করলেন মনে থাকে যেন।

—কী! আমাকে তুমি চোখ রাঙাচ্ছো? আমারই মেয়ের সর্বনাশ করে আমারই বাড়িতে দাঁড়িয়ে আবার আমাকেই কিনা—গেট আউট রাসকেল!

বলেই ফট করে আমার গালে একটা চড় মেরে বসলেন তিনি।

তাই না দেখে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো ললিতা।

—বাবা!

হরিবাবুর তখন জেদ চড়ে গেছে। সমানে তিনি চিৎকার করছেন, গেট আউট! গেট আউট!

ললিতা কী যেন বলতে গেল, কিন্তু তার বাবার চেহারা দেখে কিছুই সে বলতে পারলে না। মুখের কথা তার মুখেই আটকে রইলো।

আমার বাপ আমার গায়ে কখনও হাত তোলেননি। দাদার তো আমি আদরের ভাই! গায়ে হাত তোলা দূরে থাক, শক্ত একটা কথাও সে কোনোদিন আমাকে বলেনি। আর আজ কিনা অপদার্থ এই লোকটা আমার অপমানের বাকী কিছু রাখলে না।

রাগে তখন আমার শরীর কাঁপছে। ভাবলাম, রীতিমত এর একটা জবাব দেওয়া দরকার। কিন্তু সব কিছু সহ্য করে গেলাম শুধু ললিতার মুখ চেয়ে। আমি যদি একটা কিছু করে বসি তাহলে তার .জের গিয়ে পড়বে ললিতার উপর। সেটা মোটেই শোভন হবে না। তার ওপর এইমাত্র বাপ হয়ে ললিতাকে যে সমস্ত কথা হরিবাবু বললেন, তাতেও ললিতা রাজী হবে না। কারণ আমার বিরুদ্ধে কোন কিছুর মধ্যেই ললিতা থাকবে না, এ আমি হলফ করে বলতে পারি। তাহলে……ললিতাকে সহ্য করতে হবে তার নিষ্ঠুর বাপের হাতের নির্যাতন।

সেখান থেকে চলে আসবার আগে ললিতার দিকে তাকালাম! সে তখন আর আমার দিকে তাকাতে পারছে না। দোরের চৌকাঠের ওপর মাথা রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখলাম। নিটোল সুন্দর হাতের আড়ালে তার

মুখখানি দেখতে পেলাম না। মনে হলো সে যেন থরথর করে কাঁপছে। ফুলে ফুলে কাঁদছে কিনা তাই-বা কে জানে!

বাইরের দরজাটা ভেজানো ছিল। হাত দিয়ে খুলে বেরোতে গিয়ে দেখি হরিবাবুর চিৎকার শুনে ওই বাড়িরই জনকতক লোক সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদিকের দোরের কাছে জন-দুই-তিন বর্ষীয়সী মহিলা দাঁড়িয়ে। আর তাদেরই পাশে উঁকি মারছে রামু।

কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে না। জিজ্ঞাসা করবার ছিলই-বা কি! রামু তার আগেই বোধকরি সব প্রচার করে রেখেছে।

কারও মুখের দিকে আমি অবশ্য ভাল করে তাকাতে পারিনি। তাকালে হয়ত দেখতে পেতাম—সবার মুখেই হতাশার চিহ্ন। গোলমালটা যে এত কম হবে—সে-আশা অবশ্য কেউ করেনি। ভাবতেও পারেনি যে এমন অক্ষত অবস্থায় আমি বেরিয়ে আসবো।

আমি বেরিয়ে এলাম মাথা হেঁট করে—মাটির দিকে তাকিয়ে। কারণ লজ্জায় তখন আমি যেন মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছি।

এ সংসারের নিয়মই হচ্ছে যে, একজন যুবক আর একজন যুবতীকে একসঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে দেখলেই লোকে তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক কল্পনা করে নেয়। বিচার করে না তাদের শুদ্ধ ভালবাসাকে, বিচার করে না তাদের মনকে। সকলেই চায় তাদের বিদ্রূপ করে ভেঙে গুঁড়িয়ে

মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে। যেন কারোকে ভালবাসা একটা মহা অপরাধ! তাই কোথাও কিছু একটু সন্ধান পেলেই লোকে হয়ে ওঠে এত কৌতূহলী। বড়দাকে যেদিন পুলিসে ধরে নিয়ে গেল, সেদিনও দেখেছি, আর আজও দেখলাম। রামুর কথা সত্য কি না, কেউ তা বিচার করার দরকারও বোধ করল না।

পাড়ার সবাই আমাকে চেনে।

চেনে অমর-উকিলের ছোট ভাই বলে।

মুখে মুখে প্রচার করবার মত এমন মুখরোচক, এমন চমৎকার সংবাদ মানুষ সচরাচর খুঁজে পায় না। কাজেই শাখায়-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে এই খবরটা আজই হয়ত সর্বত্র প্রচারিত হয়ে যাবে। আমাদেরই কোনও হিতৈষী বন্ধুবান্ধব হয়ত দয়া করে এই সংবাদটি আমার দাদার কানে তুলে দিয়ে আসবে। দাদা শুনবে, বৌদি শুনবে।

কিন্তু তার আগেই এর একটা ব্যবস্থা আমার করা উচিত।

বৌদিকে বললাম, আমি যদি দু'চারদিনের জন্যে কোথাও চলে যাই বৌদি, দাদাকে বোলো—আমাকে যেন না খোঁজে। আমি আবার ফিরে আসবো।

কথাটা শুনে বৌদি চুপ করে রইলো।

—চুপ করে রইলে যে? বিশ্বাস হলো না?

বৌদি বললে, কি আর বলবো বল। এখন তো

নাবালক ছেলেমানুষটি নও। তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে।

বললাম, তাহলে আমার যে তিনশ' টাকা আছে তোমার কাছে, সেই টাকাটা দাও।

বৌদির কাছে টাকা নিয়ে চলে গেলাম আমার এক বন্ধুর বাড়ি। বন্ধুর দাদা ডাক্তারি পড়তে পড়তে রেজেস্টি করে বিয়ে করেছে এক নার্সকে। ললিতাকে নিয়ে তাদেরই বাড়িতে গিয়ে উঠবো। তারপর সেইখান থেকে সবকিছু জেনে নিয়ে ললিতাকে বিয়ে করে বাড়িতে নিয়ে আসব।

বন্ধুর দাদা উৎসাহিত হলেন কথাটা শুনে। বললেন, চলে এসো তোমরা দুজনে। আমি সব রকমে সাহায্য করবো তোমাদের।

সেই ব্যবস্থাই ঠিক রইলো।

কাউকে কিছু না জানিয়ে স্যুটকেসটি গুছিয়ে নিলাম।

প্রতিদিন দুপুরে আমি যেমন যাই সেদিনও তেমনি যাব ললিতার কাছে। ললিতার বাবা বাড়িতে থাকবে না। ললিতাকে জানিয়ে আসবো—তুমি প্রস্তুত হও। যদি সে তক্ষুনি বেরিয়ে আসতে চায়, নিয়ে আসবো। যদি বলে, একটু পরে যাব, একখানা গাড়ি ডেকে নিয়ে গিয়ে একটু দূরে রাস্তার ওপর গাড়িটা রেখে, ললিতাকে নিয়ে এসে গাড়িতে বসবো।

পরের দিন দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর বেরিয়ে গেলাম। কালকের সেই ব্যাপারের পর, ভয়ে ভয়ে যাচ্ছি—যদি কেউ দেখে ফ্যালে। সব-চেয়ে বেশী ভয় রামুকে।

তবে ভরসা এই যে, তুপুরে বড় একটা কেউ থাকে না। পুরুষেরা সবাই বেরিয়ে যায় কাজে। মেয়েরা থাকে ঘরের ভেতর।

রামু টোটো করে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

সদর দরজাটা খোলাই ছিল। চট্ করে ঢুকে পড়লাম। ললিতা তাদের দরজার কপাটতুটো ভেজিয়ে রেখে দেয় শুধু আমারই জন্যে। সেদিনও দেখলাম, খোলাই আছে। হাত দিয়ে ঠেলতেই খুলে গেল।

চুপি চুপি সোজা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

কিন্তু এ কি! ললিতা কোথায়!

ডাকলাম, ললিতা!

কারও কোনও সাড়াশব্দ পেলাম না।

এতক্ষণে চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম, ঘরের জিনিস-পত্র একটিও নেই। বিছানা, বাসন, মাত্বর, শতরঞ্চি, ভাঙা মোড়া, টিনের তুটো চেয়ার, কাঠের একটা তক্তপোশ—দেয়ালে টাঙানো তুটো ছবি—সব ফাঁকা মাটির একটা জলের কলসীমাত্র পড়ে রয়েছে।

মাথাটা চম্ করে ঘুরে গেল।

সর্বনাশা মানুষ এই হরিবাবু! বুঝলাম বাড়ি ছেড়ে দিয়ে তিনি সরে পড়েছেন। বাড়ির জিনিসপত্রের সঙ্গে ললিতাকেও তিনি নিয়ে গেছেন।

ললিতা হয়ত যেতে চায়নি, হয়ত কেঁদেছে, হয়ত-বা বলেছে আমি যাব না। কিন্তু ওই তো শান্তশিষ্ট ছোট্ট একটি পাখির মত মেয়ে, ওর আর কতটুকুই-বা শক্তি!

ফাঁকা এই বাড়িটার মত আমার বুকের ভেতরটাও ফাঁকা হয়ে গেল।

কিন্তু এরা গেল কোথায় ?

ললিতা কি কোনও নিদর্শন রেখে যায়নি আমার জন্যে ? প্রতিটি কাগজের টুকরো কুড়িয়ে কুড়িয়ে দেখলাম। কোথাও কিছু পেলাম না।

কী যেন একটা সিনেমার ছবিতে দেখেছিলাম, গল্পের নায়ক বাড়ি থেকে পালাবার আগে দেয়ালের গায়ে পেন্‌সিল দিয়ে লিখে রেখে গিয়েছিল তার পালাবার খবর।

সুইচ টিপে ঘরের আলো জ্বেলে দেখলাম—কোথাও কিছু লেখা নেই।

ললিতা হয়ত নিজেই জানে না—তার বাপ তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু গেল কখন ?

এক পা এক পা করে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখি, রামু আসছে ছুটতে ছুটতে। তার সঙ্গে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক।

আমাকে দেখেই রামু দাঁড়িয়ে পড়লো।

ভাবলাম বুঝি কালকের ব্যাপারটার জন্যে আমার কাছে সে লজ্জায় পড়েছে, তাই কি করবে, কি বলবে, সে বুঝতে পারছে না।

কিন্তু সে ভুল আমার ভাঙতে বেশী দেরি হলো না। তার সঙ্গে যিনি আসছিলেন, বুড়ো মানুষ—খানিকটা

পিছিয়ে পড়েছিলন তিনি। রামু দাঁড়িয়েছিল আমার জন্যে নয়, তাঁরই জন্যে।

তিনি আসতেই আঙুল বাড়িয়ে রামু আমাকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, এই ইনিই তাড়িয়েছেন আপনার ভাড়াটেকে।

বুঝলাম, তিনি এই বাড়ির বাড়িওলা।

বুড়ো ভদ্রলোক—চোখে বোধহয় একটু কম দেখেন। আমার মুখের দিকে তাকালেন তিনি। বললেন, হ্যাঁ মশাই, আপনি তাড়িয়েছেন হরিবাবুকে ?

বললাম, ওই ছোঁড়াটার কথা আপনি বিশ্বাস করেন?

—কী জানি মশাই, ও-ই তো আমাকে এই সুখবরটি দিলে।

আরও কি যেন তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, রামু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো।—'কী বললেন ? আমাকে বিশ্বাস করবেন না ? আমি ঠিক বলেছি। হরিবাবুর মেয়েটাকে নিয়ে যে-কাণ্ড উনি করলেন, শুধু সেইজন্যেই হরিবাবু পালিয়ে গেল এখান থেকে।'

বাড়িওলা ভদ্রলোক রামুর একখানা হাত চেপে ধরলেন। বললেন, ঝগড়া কোরো না বাবা। উনি খুব ভাল কাজ করেছেন।

এই বলে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ছয়টি মাস ধরে একটি পয়সা আদায় করতে পারিনি মশাই। লোকটা ভাড়াও দিচ্ছিল না, বাড়িও ছাড়ছিল না। ব্যাটাকে তাড়িয়ে আপনি আমার খুব উপকার করেছেন।

তিনি যে এ-কথা বলবেন রামু তা আশা করেনি।

ছ'মাসের বাড়ির ভাড়া যার কাছে বাকি পড়ে রয়েছে, সে-লোক একটি পয়সা না দিয়ে লুকিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেলে যে বাড়ির মালিক খুশী হতে পারে—সে বোধটুকুও রামুর ছিল না।

নেহাত ছেলেমানুষ রামু।

ছেলেমানুষ না হলে হরিবাবুকে তাড়ানোর অপবাদটা সে আমার ওপর দিতে পারতো না।

হরিবাবু কোথায় গেছেন যদি জানতে পারি তো আমি এক্ষুনি ছুটবো তাঁর কাছে। রামু চেয়েছিল যেন তেন প্রকারে আমাকে অপমান করতে। সেই অপমান করা হল না দেখে মনে মনে সে হয় তো হতাশই হল।

কিন্তু কেউ জানে না হরিবাবু কোথায় গেছেন। এমন কি, কখন গেছেন সেকথাও বলতে পারলে না কেউ।

এতগুলো লোকের চোখে ধুলো দিয়ে, বাড়ির প্রতিটি জিনিসের সঙ্গে ললিতাকে নিয়ে কেমন করে যে তিনি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গেলেন সেইটিই আশ্চর্য।

তারপর পুরো দুটি বছর পার হয়ে গেছে।

হরিবাবুকে ভুলে গেছে সবাই। ললিতাকেও ভুলেছে।

ভুলিনি শুধু আমি।

এই মহানগরীর অগণিত জনস্রোতে কোথায় ভেসে গেছে তারা দুটি প্রাণী—কেই-বা তার খোঁজ রাখে!

পথে পথে অনেক খুঁজেছি। পাইনি।

বৌদি এ-বাড়িটা ছেড়ে দিতে চাইলে। নিশ্চিন্ত হলাম।

এই বাড়ি, এই পাড়া ছেড়ে দিতে পারলে যেন বাঁচি।

বাড়ির খোঁজ করতে গিয়ে পেয়েছিলাম বড়দাকে। তাও তো আবার সেদিন সে হারিয়ে গেল।

মানুষের জীবনস্রোত এ-পৃথিবীতে ঠিক এমনি করেই বয়ে চলে। কে যে কোথায় কখন হারিয়ে যায় কেউ বলতে পারে না।

এতদিন পরে, যা কোনোদিন ভাবতে পারিনি তাই ঘটলো। আবার দেখলাম হরিবাবুকে। দেখলাম আমাদেরই বাড়িতে। দাদার কাছে বসে আছেন বাইরের ঘরে।

ললিতাকে আবার যেন নতুন করে ফিরে পেলাম। আমার সেই পিঞ্জরাবদ্ধ বন্দিনী ললিতাকে।

কিন্তু হরিবাবুর সঙ্গে আমার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি শুধু চাই তার ঠিকানা।

ঠিকানাটা দাদা নিশ্চয়ই জেনে নেবে হরিবাবুর কাছ থেকে। তবু একবার বৌদিকে বললাম, দাদাকে একবার ডাকো না বৌদি!

—না। এখন আমি ডাকতে পারব না। তুমি ডাকো।

বললাম, ওই লোকটার কাছে আমি বেরুবো না বৌদি।

বৌদি আবার আরম্ভ করলে ললিতাকে নিয়ে রসিকতা।

বললে, ললিতা তোমার কী এমন মেয়ে রে বাবা, যে তোমার মুণ্ডুটি ঘুরিয়ে দিলে! একবার দেখাবে তাকে ?

বললাম, দেখাবো বলেই তো তার ঠিকানাটা চাইছি বৌদি।

—জ্বালালে তুমি!

বৌদি এগিয়ে গেল দাদার ঘরের দিকে।

বাইরে থেকে ঠক ঠক করে আওয়াজ করলেই দাদা বেরিয়ে আসবে ঘর থেকে।

আওয়াজ বৌদি করলে, কিন্তু দাদা এলো না বেরিয়ে। ভেতর থেকেই বললে, বল কি বলবে। কেউ নেই ঘরে।

আমি একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

বৌদি বললে, ঠাকুরপো! হলো না। মক্কেল তোমার চলে গেছে।

সর্বনাশ! চলে গেছে ?

ঠিকানা না রেখে যায়নি নিশ্চয়ই। তাড়াতাড়ি ঢুকলাম গিয়ে দাদার ঘরে। বললাম, এতদিন পরে হরিবাবুর টাকা ফিরিয়ে দেবার কথা মনে পড়লো বুঝি ?

দাদা বললে, টাকা ও আর দিয়েছে! ব্যাটা টাকা দিতে আসেনি।

বৌদি ঘরে ঢুকলো। বললে, তাহ'লে কি জন্যে এসেছিল ?

দাদা বললে, বিপদে পড়েছে লোকটা। তাই এসেছিল আমার কাছে আইনের পরামর্শ নিতে।

বৌদি জিজ্ঞাসা করলে, টাকার কথা কিছু বললে না?

দাদা বললে, অবাক হয়ে গেলাম ওর কাণ্ড দেখে। টাকার কথা মুখ দিয়ে একটিবার উচ্চারণ পর্যন্ত করলে না। আমি নিজে একবার ভাবলাম বলি। কিন্তু আমার লজ্জা হলো। বলতে পারলাম না। ওর কিন্তু এতটুকু লজ্জা হলো না।

বৌদি বললে, তুমিও যেমন! এর পরেও আইনের পরামর্শ তুমি দিলে ওকে?

দাদা বললে, পরামর্শ কি দেবো ছাই! অতি নোংরা ব্যাপার যে!

নোংরা ব্যাপারটা কি তাই জানতে চাইলে বৌদি।

দাদা আমার মুখের দিকে একবার তাকালে। জিজ্ঞাসা করলে, ওর একটা মেয়ে আছে, না?

বললাম, আছে।

দাদা বললে, সেই মেয়েটাকে নিয়ে এক কাণ্ড হয়ে গেছে। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন। হরিবাবু বললে, তার সেই মেয়েটাকে নিয়ে বাড়ি থেকে পালাচ্ছিল এক ভদ্রলোক।

দাদার কথাটা ধক করে আমার বুকে এসে বাজলো। বলে ফেললাম, তার পর?

—হরিবাবু লোকটাকে নাকি ধরে ফেলেছে। তারপর

যা হয়ে থাকে। পুলিস এসেছে। ধরেছে লোকটাকে। চালান দিয়েছে। কেস চলছে।

বললাম, এর জন্যে হরিবাবুর আইনের পরামর্শ দরকার হলো কেন ?

দাদা বললে,সেই জন্যেই তো সন্দেহ হচ্ছে। মেয়েটাকে নিয়ে লোকটা পালাচ্ছিল, না, লোকটাকে নিয়ে মেয়েটা পালাচ্ছিল—তাই বা কে জানে।

জিজ্ঞাসা করলাম, হরিবাবু এখন থাকেন কোথায় ? ঠিকানা বললে না ?

দাদা বললে, কই না, সে-সব কিছু বললে না। আমিও জানতে চাইলাম না। টাকার আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি।

—তুমি ছাড়লে কি হবে ? বৌদি বললে, ঠাকুরপো এখনও আশা ছাড়েনি।

এই বলে বৌদি আমার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে একবার হাসলে। হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একথা শুনে লজ্জায় আমার মুখচোখ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু লজ্জা করলে চলবে না। লজ্জার সময় এটা নয়। বৌদি বললে এক ভেবে, আর দাদা বুঝলে অন্যরকম।

দাদা বললে, এই তো মঙ্গলবার মামলার দিন আছে পুলিস কোর্টে। সেখানে গিয়ে একটু খুঁজলেই ওকে দেখতে পাবি। কিন্তু গিয়ে কিচ্ছু লাভ হবে না।

লাভ আমার কিছু হোক আর না হোক—গেলাম আদালতে। না গিয়ে থাকতে পারলাম না।

খুব বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হলো না।

শুনলাম নারীহরণের মামলা চলছে মাত্র একটি ঘরে। সেই ঘরে সোজা ঢুকতে গিয়ে কিন্তু দোরের পাশে আমাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো।

দাঁড়িয়ে পড়লাম—বিস্মিত নির্বাক হয়ে।

স্তম্ভিত বললেই অবশ্য ঠিক বলা হয়। কিন্তু না, স্তম্ভিত হবার মত ঘটনা পৃথিবীতে আর যেন কিছু ঘটছে না।

দেখলাম, আসামীর কাঠগড়ায় বড়দা দাঁড়িয়ে।

ভাবলাম বুঝি ভুল করে ঢুকেছি এ-ঘরে। সেই হাস্যময় নিরাসক্ত নির্বিকার মানুষটি এমন কী অপরাধ করতে পারে যার জন্য আজ সে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হয়েছে জানবার কৌতূহল হলো।

তাহ'লে ললিতার মামলা কোন্ ঘরে চলছে জানবার জন্যে আরও একটু এগিয়ে গেলাম। কোনও একজন উকিলকে জিজ্ঞাসা করবো কিনা ভাবছি, এমন সময় আমার নজর পড়লো হরিবাবুর দিকে।

সব কৌতূহলের নিরসন হয়ে গেল।

নারীহরণ মামলার আসামী বড়দা! এর পরও পৃথিবীতে অবিশ্বাস্য আর কিছু থাকতে পারে? সবকিছু যেন আমার কাছে গুলিয়ে যেতে লাগল। যাহোক, আমার ভাবনায় ছেদ পড়লো।

মামলা শুরু হলো।

আজ বোধহয় প্রথম দিন নয়। সেদিন যা শুনলাম তাই বলি।

উকিল জিজ্ঞাসা করলেন বড়দাকেঃ তুমি মদ খাও ?

বড়দা বললে, আবার 'তুমি' বললেন ? বলুন, ক্ষতি নেই। কিন্তু আপনার ওপর আমার অশ্রদ্ধা হয়ে যাবে। মনে হবে—মানুষকে আপনি অবজ্ঞা করেন।

—থাক্, ও-সব বড় বড় কথা বলতে হবে না। 'আপনি' বলছি। বলুন আপনি মদ খান কি-না!

বড়দা অম্লানমুখে বলে বসলো, আজ্ঞে হ্যাঁ, খাই।

—রোজ খান ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তা একরকম রোজই বলতে পারেন!

—কখন খান ? চব্বিশ ঘণ্টা ?

—চব্বিশ ঘণ্টা খেতে পারলে ভাল হতো, কিন্তু পারি না। রাত্রে খাই।

—কি কাজ করেন আপনি ?

—আপাততঃ কিছুই করি না! টোঁ টো করে ঘুরে বেড়াই। খুঁজে বেড়াই।

—কি খোঁজেন ?

—মনের শান্তি।

—আপনার চলে কেমন করে ?

—জমানো টাকা আছে।

—কোথায় আছে ?

—ব্যাঙ্কে।

—প্রমাণ করতে পারেন ?

বড়দা হাসলে। বললে, আমার বাসা থেকে যে

স্থটকেসটা আনা হয়েছে, তার ভেতর দেখুন ব্যাঙ্কের কাগজপত্র সবই আছে।

—লেখাপড়া কতদূর করেছেন?

—সামান্য।

—তাহ'লেও বলুন কোন্ ক্লাস পর্যন্ত।

—ফোর্থ ইয়ার ক্লাস পর্যন্ত।

—তার মানে? আপনি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন?

আবার হাসলে বড়দা। বললে, আজ্ঞে না। সে পাত্র আপনি ন'ন। আপনি কোন্ ক্লাস পর্যন্ত না জিজ্ঞাসা করলে আমি বলতাম বি-এ পাস করেছি।

—কাজকর্ম কিছু করেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কিছু করেছি বই-কি! নইলে ব্যাঙ্কের ওই টাকাটা এলো কোত্থেকে?

—এখন কিছু করেন?

—আজ্ঞে না। দরকার হয় না।

—বেশ। এবার আপনাকে যা-যা বলবো আপনি ঠিক-ঠিক জবাব দেবেন। অবান্তর কিছু বলবেন না।

বড়দা বললে, বলুন।

উকিল বললেন, গত পনেরোই এপ্রিল বিকেলে হরিবাবু বাড়ি ছিলেন না। আপনি সোজা তাঁর বাড়ির ভেতর ঢুকে গিয়ে তাঁর যুবতী কন্যা শ্রীমতী ললিতাকে বলেন, তোমার বাবা রাস্তার ওপর গাড়ি চাপা পড়েছে, তুমি চট্ করে এসো আমার সঙ্গে। এই বলে ললিতাকে সঙ্গে নিয়ে আপনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছিলেন। কিন্তু

আপনার দুর্ভাগ্য বাড়ির সুমুখেই হরিবাবুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। বলুন সত্যি কিনা!

বড়দা বললে, সত্যি।

—তাহ'লে আপনি শ্রীমতী ললিতাকে মিথ্যা কথা বলেছিলেন?

বড়দা অবলীলাক্রমে বলে বসলো, বলেছিলাম।

—আপনি বলেছেন, শ্রীমতী ললিতা দেবীর বাবা হরিবাবুকে অনেক টাকা দিয়ে আপনি তাঁর প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন। কথাটা সত্যি?

—সত্যি।

—এর পশ্চাতে নিশ্চয়ই আপনার কোনও উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্যটি কী আপনি বলতে পারেন?

বড়দা বললে, উদ্দেশ্য এমন কিছু ছিল বলে তো মনে হয় না। হরিবাবু বার-বার বিপদে পড়ে টাকা চাইতেন, আমি দিতাম।

—কিন্তু হরিবাবু বলেন, টাকা তিনি নেননি আপনার কাছ থেকে। যে দু'দশ টাকা আপনি দিয়েছেন, সে শুধু তাঁর কন্যা ললিতার 'দকে তাকিয়ে।

বড়দা বললে, তা হয়ত হবে। ওঁর কন্যা ললিতাকে আমার খুব ভাল লেগেছিল। তবে হরিবাবুকে অনেক টাকা আমি দিয়েছি। সেকথা তিনি আজ অস্বীকার করতে পারেন কিন্তু আমি অস্বীকার করতে পারি না। কারণ টাকাটা হচ্ছে আমার রোজগারের। খাটুনির পয়সা, কাজেই অস্বীকার করি কি করে—বলুন?

—আপনি যে হরিবাবুকে অনেক টাকা দিয়েছেন তার প্রমাণ আছে ?

—প্রমাণ ? বড়দা ম্লান একটু হাসলে। হেসে বললে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নগদ টাকাই দিয়েছি। কাজেই তার প্রমাণ আমি দিতে পারবো না। কিছু প্রমাণ আমি দিতে পারি, কিন্তু সে প্রমাণের সঙ্গে এ-মামলার বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নেই।

—আপনি থামুন মশাই! অত সব ভাববার দরকার নেই আপনার। প্রমাণ আপনি দিতে পারেন কিনা তাই বলুন।

—পারি, কিন্তু হরিবাবু বিপদে পড়বেন। তাঁকে বিপদে ফেলতে আমি চাই না। আমি যেটুকু চাই সেইটুকু পেলেই আমি খুশী থাকবো।

—হেঁয়ালী রাখুন। হরিবাবু বলেছেন, টাকা তিনি নেননি আপনার কাছ থেকে। আপনি মিথ্যা বলছেন।

বড়দা বললে, একান্তই শুনবেন তাহ'লে। হরিবাবুকে চারবার চারটি চেক্ আমি দিয়েছি। সে চেক্ উনি আবার 'এন্‌ডোর্স' করে দিয়েছেন—অন্য লোককে। দুটি দিয়েছেন নাগার্জুন আয়ুর্বেদ ফার্মেসীকে। আর দুটি দিয়েছেন রঙ্গলাল মহতোকে। একজন বিক্রি করেছে 'মদনানন্দ মোদক' আর একজন বিক্রি করেছে 'মদ'। আমি তাদের ঠিকানা দিচ্ছি। তারা আসুক আদালতে। সবই বুঝতে পারবেন তাহ'লে।

অনেকদিন ধরে চলবার মামলা নয়। তবু মামলাটি চললো অনেকদিন ধরে।

বড়দার অপরাধ একরকম প্রমাণিত হয়ে গেছে। তবু বড়দা বলছে—সে নির্দোষ। বাড়ির একটি নিরীহ মেয়েকে যে-লোক মিথ্যা প্রবঞ্চনা করে পথে বের করে নিয়ে যেতে পারে, কোন্ সাহসে সে নিজেকে নির্দোষ বলছে বুঝতে পারছি না। বড়দার ওপর রাগে বিতৃষ্ণায় আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। পাছে কোনোদিন চোখে চোখ পড়ে যায়, তাই নিতান্ত সঙ্গোপনে আদালতের একপাশে লোকজনের ভিড়ের মাঝখানে চুপ করে বসে বসে সব শুনছি। দেখাই যাক্ শেষ পর্যন্ত কি হয়! কেবল মনে হয়, ঐ ভালো মানুষটার মধ্যে এতবড় শয়তানী লুকিয়ে ছিল ?

হরিবাবুর সামনে গিয়ে আমি দাঁড়াতে পারিনি কোনোদিন। কাজেই তাঁর ঠিকানাও আমার জানা হয়নি।

একদিন ভেবেছিলাম, দাদাকে বলে পেশকারের কাছ থেকে ঠিকানাটা জেনে নিই। ললিতার সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। কিন্তু তা আর হয়ে উঠলো না শেষ পর্যন্ত।

নাগার্জুন আয়ুর্বেদ ফার্মেসীর লোক এলেন। তিনি যা বললেন, শুনে শুধু বোকার মত হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। হরিবাবুকে তিনি সনাক্ত করলেন। বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, ইনিই কবিরাজ শ্রীহরিচরণ বিদ্যাবিনোদ, কাব্যতীর্থ। এঁর সঙ্গে আমাদের লেন-দেন কারবার আছে।

হরিবাবু হঠাৎ কবিরাজ হলেন কেমন করে বুঝতে পারলাম না। তার ওপর বিদ্যাবিনোদ, কাব্যতীর্থ। কলকাতা শহরে সবই সম্ভব।

নাগার্জুন আয়ুর্বেদ ফার্মেসীর ভদ্রলোক বললেন, কবিরাজমশাই তাঁর কবিরাজখানার জন্য তাঁদের দোকান থেকে ওষুধপত্র প্রায়ই কিনে থাকেন। সব চেয়ে বেশি কেনেন মদনানন্দ মোদক। তারই মূল্য বাবদ দু'বার দুটি অন্য লোকের চেক দিয়েছিলেন। সে চেকের টাকা তাঁরা ব্যাঙ্ক থেকে পেয়ে গেছেন।

কবিরাজ কিনেছেন মদনানন্দ মোদক। অন্যায় কিছু করেননি।

এই রকম ধারণাই যেন হলো হাকিমের। কাজেই আর-একজন সাক্ষী রঙ্গলাল মহতোর কথা ভাল করে তিনি শুনতেই চাইলেন না।

তিনি না চাইলেও রঙ্গলাল তার কর্তব্য ঠিক করে গেল। বেঁটেখাটো ছোট্ট মানুষটি, মাথাটি যেমন ছোট, পেটটি তেমনি বড়। গুট গুট করে এসে দাঁড়ালো সাক্ষীর কাঠগড়ায়। হলফ করতে গিয়ে ধমকে দিলে আদালতের পেয়াদাকে। বললে, আরে লাও লাও, ঝুঠা বাৎ হামি বোলি না। ঝুঠা বাৎ আর কিঁসু রাখিয়েসে নাকি হামকো বাস্তে? হামার বাপ্-দাদা সব শেষ করিয়ে দিয়েসে।

সারা কোর্টঘর ফেটে পড়েছে হাসির চোটে।

রঙ্গলাল তার ছোট ছোট চোখদুটি এদিক ওদিক ঘুরিয়ে বলে উঠেছে, হাসো মাৎ ভাইয়োঁ! হাসো মাৎ!

উকিলের কথার জবাবে যে-সব কথা সে বলেছে তার প্রত্যেকটি কথা আমার মনে নেই। আমি সাহিত্যিক নই, কাজেই গুছিয়ে ঠিক লিখতেও পারবো না।

তবে লোকটি আমাদের হাসিয়েছে খুব।

উকিল জিজ্ঞাসা করেছেন, আপনি কি কাজ করেন?

রঙ্গলাল বলেছে, বাংলায় বোলি?

—হ্যাঁ, আপনি বাংলায় বলুন।

রঙ্গলাল হেসেছে। ছোট ছোট দাঁতগুলি দেখতে পাওয়া গেছে। দাঁতের রং যে এত কালো হয় তা আমার জানা ছিল না। এর সঙ্গে কেবল তুলনা চলে তরমুজের বিচির সঙ্গে। কেন হয়েছে সেই জানে।

হেসে হেসে তার কাল কাল দাঁতগুলি বের করে রঙ্গলাল বলেছে, বাচ্‌পন্‌সে মছ্‌লি ভাত খাইয়ে খাইয়ে বাঙ্গাল হয়ে গেসি। কি পুছলেন নিস্‌পেক্টর-সাব?

—কি করেন আপনি?

রঙ্গলাল বলেছে, বড়ি শরম্‌কা বাৎ। পেটকা বাস্তে দুটি দুকান আসে হুজুর। শরাবকা দুকান। একটি বিলাইতি। একটি দেশী।

হরিবাবুকে দেখিয়ে উকিল বলেছেন, এঁকে চেনেন?

—হাঁ হাঁ। পণ্ডিতজিকে চিনি।

বলেই সে তার দুটি আঙুল দিয়ে নিজের নাকটি টিপে ধরে বলেছে, এমনি করে পণ্ডিতজি হামার দুকানে ছিপ্‌কে ছিপ্‌কে ঘুঁষিয়ে পড়েন, আবার ছিপ্‌কে ছিপ্‌কে বাহার নিক্‌লে আসেন।

উকিল জিজ্ঞাসা করেছেন, কেন? উনি আপনার মদের দোকানে কি জন্যে যান?

রঙ্গলাল বলেছে, পণ্ডিতজি হামাকে 'এম্‌টি' বোতল সাপ্লাই করেন। উহি সব টুটা-ফুটা হইলো কিনা দেখিয়ে আসতে হয়।

উকিল বলেছেন, তার জন্যে আপনারাই তো ওঁকে টাকা দেবেন। তা উনি আপনাকে দুটো চেক্ দিলেন কেন?

রঙ্গলাল বলেছে, হাঁ, ই-বাৎ হুজুর পুছতে পারেন। এক দফে পণ্ডিতজি একশ' রুপেয়া পেতেন হামারা পাশ্‌সে। ইক্‌রোজ পণ্ডিতজিকা বহুৎ জরুরত পড়ি গেলো। বোললেন, রংলাল-ভাইয়া, পাঁঞ্চ শো রুপিয়া হামাকে দিতে হবে উধার। নেহি তো হামি মরিয়ে যাব। হামি দিয়ে দিলো। উহি রুপিয়া পণ্ডিতজি হামাকে আপোস্ দি[illegible]স চিক্‌মে। ঝুঠা বাৎ হাম্ তো বলবে নাই ল[illegible] কোনও ক[illegible] [illegible]মি পাইয়ে গেসি বাঙ্ক্‌সে।

[illegible]ন আমাকে একটা ট্যাক্সিতে [illegible] কথা বলেছিল রঙ্গলাল। বললে, অবাক হয়ে গেছ, না? [illegible]র্দা কিছুই রেখে

বললাম, তা হয়েছি।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাব বাবু?

বড়দা বললে, চৌরঙ্গীর একটা হোটেলে। খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

বলেই হাত বাড়িয়ে বড়দা আমাকে তার কাছে টেনে নিলে। বললে, চুপ করে থেকো না, কিছু বল।

যে-কথাটা ব[illegible] জন্যে মন আমার ব্যাকুল হয়ে

কিন্তু আসামীকে দণ্ড দেবার আগে, তার আত্মপক্ষ-সমর্থনের সুযোগ দেওয়া আদালতের চিরন্তন রীতি।

এ-ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

রায় দেবার আগে বড়দার উকিলকে হাকিম বললেন, আসামীর সাফাই সাক্ষী যদি কেউ থাকে তো তাকে তলব করতে পারেন।

সাফাই সাক্ষীদের নাম শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

আমি একা অবাক হইনি। কোর্টরুমে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, সবাই কেমন যেন বিস্মিত হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

এক নম্বর সাফাই সাক্ষী—কবিরাজ হরিচরণ বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ।

দু' নম্বর—শ্রীমতী ললিতা দেবী।

তিন নম্বর—শ্রীমতী কিরণশশী দেবী।

কে এই কিরণশশী দেবী ... নামটা শুনেই হরিবাবু দেখলা... শরমৃকা বাৎ। পেটকা বাত্তে একবার কো... ...ুর। শরাবকা দুকান। একটি ...ভ। একটি দেশী।

হরিবাবুকে দেখিয়ে উকিল বলেছেন, এঁকে চেনেন ?

—হাঁ হাঁ। পণ্ডিতজিকে চিনি।

বলেই সে তার দুটি আঙুল দিয়ে নিজের নাকটি টিপে ধরে বলেছে, এমনি করে পণ্ডিতজি হামার দুকানে ছিপ্‌কে ছিপ্‌কে ঘুঁষিয়ে পড়েন, আবার ছিপ্‌কে ছিপ্‌কে বাহার নিক্‌লে আসেন।

ললিতা আসবে আদালতে, তাকে দেখতে পাব, তার মুখ থেকে শুনবো সে কি বলতে চায়—এই কথা ভাবতে ভাবতে সেদিন কেমন যেন আমি একটুখানি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

ট্রামে অসম্ভব ভিড়। চড়তে পারলাম না।

তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ধরে পালিয়ে যাব ভেবে ট্যাক্সিস্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ একেবারে মুখোমুখি দেখা বড়দার সঙ্গে।

সুন্দরী একটা মেয়েকে নিয়ে পালাবার পথে যে-লোক ধরা পড়ে আদালতের আসামী হয়েছে, তাকে ভাল করে দেখবার জন্যে—তার সঙ্গে দুটো কথা বলবার জন্যে মানুষের আগ্রহের অন্ত নেই। একগাদা লোক ছুটে আসছিল বড়দার পিছু পিছু। তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যেই বড়দাও বোধকরি ট্যাক্সি ধরতে এসেছিল। আমাকে কোনও কথা বলবার অবসর দিলে না বড়দা। টেনে আমাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে প্রথম কথাই বললে, অবাক হয়ে গেছ, না?

বললাম, তা হয়েছি।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাব বাবু?

বড়দা বললে, চৌরঙ্গীর একটা হোটেলে। খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

বলেই হাত বাড়িয়ে বড়দা আমাকে তার কাছে টেনে নিলে। বললে, চুপ করে থেকো না, কিছু বল।

যে-কথাটা বলবার জন্যে মন আমার ব্যাকুল হয়ে

উঠেছিল সেই কথাটাই বললাম।—'আচ্ছা বড়দা, ললিতা মেয়েটা কি সত্যিই খারাপ ?'

খারাপ !

বড়দা যেন রেগে উঠলো। বললে, অত ভাল মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি। ভাল বলেই তো আমার লোভ !

—তুমি বলছো কি বড়দা ? ললিতার বয়স কত ?

বড়দা বললে, আমার মেয়ের বয়সী।

বলেই চোখদুটো বন্ধ করে মনে হলো ললিতাকে যেন সে একবার দেখে নিলে। জিজ্ঞাসা করলে, তুমি চেন নাকি ললিতাকে ?

বললাম, না।

বড়দা বললে, পরশু আসবে। একবার দেখো ভাল করে।

—তুমি কি সত্যিই ওকে নিয়ে পালাতে চেয়েছিলে ?

বড়দা বললে, নিশ্চয়।

বললাম, ললিতাকে তুমি বলেছিলে—তার বাবা মোটর চাপা পড়েছে রাস্তায়। তারপর ললিতাকে যখন তুমি তার বাবাকে সেরকম অবস্থায় দেখাতে পারতে না, তখনও কি সে তোমাকে বিশ্বাস করে যেতো তোমার সঙ্গে ?

বড়দা হো হো করে হেসে উঠলো। বললে, ওরে বাবা, উকিলের মত জেরা করছ যে! রোজই তো আসছ আদালতে। শেষ পর্যন্ত দ্যাখো। এখন ললিতার কথা থাক্‌। অন্য কথা বল।

বলবার মত আমার অন্য কথা কীই-বা আছে! তবু বললাম। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি মদ খাও বড়দা ?

বড়দা বললে, খাই। আমার একটা রোগ আছে। সেই রোগটা যখন জানান দেয়, তখন মদ খেলে একটু ভাল থাকি।

এই মদ খাওয়ার কথা বলতে গিয়ে বড়দা আমাকে অনেক কথাই বললে। বললে, সারাদিন পথে পথে যখন টোঁ টোঁ করে ঘুরে বেড়াই, তখন মদ খেতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করে তখন—যখন সারাদিনের পর রাত্রে নিজের ঘরে গিয়ে দাঁড়াই। একা ঘরে চুপ করে বসে বসে ভাবি—এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার কেউ নেই কিছু নেই। তামাম দুনিয়াটা যেন আমায় গিলে খেতে আসে। সে যে কি অসহ্য যন্ত্রণা তা বলে বোঝান যায় না। সব-কিছু যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। ঘরের চারটে ফাঁকা দেয়াল আমাকে যেন চেপে মেরে ফেলতে চায়। আমার সেই পুরনো রোগটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। একটা কিছু নেশা করবার জন্যে আমি ছটফট করতে থাকি। নেশা করে ভুলে থাকতে চাই। সব রকম নেশাই আমি করে দেখেছি, কিন্তু মদই হলো নেশার রাজা। এই মদ জিনিসটাকে আমি চিরকালই ঘৃণা করতাম। হঠাৎ ভালবেসে ফেললাম যুদ্ধের সময় বর্মা মুলুকে গিয়ে মিলিটারি ক্যাম্পে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি যুদ্ধে গিয়েছিলে? লড়াই করতে?

বড়দা হেসে বললে, না লড়াই করতে নয়। মোটর চালাতে। একটা ড্রাইভারীর চাকরি নিয়ে চলে

গিয়েছিলাম। গিয়ে সেখানে জুটে পড়ি এক ঠিকাদারের সঙ্গে। অনেক দিন ধরে অনেক টাকা রোজগার করে ফিরে আসি কলকাতায়।

গাড়ি আমাদের চৌরঙ্গীতে এসে পড়েছিল। গাড়ি থামিয়ে তার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বড়দা আমাকে নিয়ে গিয়ে তুললে একটা বড় হোটেলে।

খাবার টেবিলে বসে বড়দা আবার আরম্ভ করলে গল্প। অনেকদিন পরে আমার মত একজন শ্রোতা পেয়েই কিনা জানি না অনেককিছু সে বলে ফেললে। কিন্তু তবু এই মানুষটিকে আমি চিনতে পারলাম না। সে রয়ে গেল আমার কাছে চিরবিস্ময়।

বড়দা বললে, কি বলছিলাম? মদ খাওয়ার কথা?

বললাম, হ্যাঁ।

বড়দা বললে, একদিন অমনি অনেক রাত্রে ইচ্ছে হলো মদ খাবার। কিন্তু এত রাত্রে কোথায় যাই? একজন বন্ধু বললে, ডবল দাম যদি দিতে পারেন তো পারি আপনাকে মদ খাওয়াতে। বললাম, দেবো ডবল দাম। চলুন। তিনি আমাকে রীতিমত একটি ভদ্র পল্লীর ভেতর ছোট্ট একটি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুললেন। দেখলাম এক কবিরাজের বাড়ি। ঘরের এককোণে ভাঙা একটা কাঁচ-দেওয়া আলমারি। আলমারিতে কয়েকটি লেবেল-আঁটা কাঁচের জার, চিনে-মাটির বোয়েম। নানারকম কবিরাজী ওষুধের নাম লেখা। কেরোসিন-কাঠের নড়বড়ে একটা টেবিলের ওপর কিছু কাগজপত্র, দোয়াত-কলম

নিয়ে যিনি বসেছিলেন তিনিই কবিরাজ শ্রীহরিচরণ বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ।

আমাকে যিনি নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়ে চুপি চুপি কি যেন বললেন।

হরিবাবু তাঁর বাঁহাতটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, সাত টাকা।

দশ টাকার নোট একখানি তাঁর হাতে দিতেই আলমারির পেছন থেকে একটি বোতল এনে আমার হাতে দিয়ে হরিবাবু বললেন, তিনটে টাকা তো আমার কাছে নেই। আপনাকে ফেরত দেবো কেমন করে?

বললাম, থাক্। আমি আবার আসবো।

প্রায় রোজই যেতে আরম্ভ করলাম। পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হলো। ডবলের চেয়ে বেশি দাম দিয়ে মদ কিনে ওইখানে বসেই খেতে লাগলাম। হরিবাবুকেও সাকৃরেদ করে নিলাম।

হরিবাবুকে যেন আমি চিনি না, কিছুই যেন জানি না—এমনিভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, হরিবাবুও মদ খান?

বড়দা হেসে উঠলো। বললে, খান না আবার! আমরা তার কাছে শিশু। এই বলে হাসতে হাসতে একদিনের একটা ঘটনা বললে।

—পরের পয়সায় নেশা—অনেকে একটু বেশিই করে ফেলে। হরিবাবু একদিন মনের আনন্দে খেয়ে ফেললেন অনেকখানি। কথা বলতে বলতে হঠাৎ তাঁর মনে হলো আমার নামটি তাঁর এখনও জানা হয়নি। জিজ্ঞাসা

করলেন, আপনার নামটি কি? কি বলে ডাকবো আপনাকে? এইরকম লোকের কাছে নিজের নামটা বলতে গিয়ে কেমন যেন বেধে গেল। বললাম, আমাকে সবাই বড়দা বলে ডাকে। আপনিও বড়দা বলবেন। হরিবাবু নেশার ঝোঁকে চট্ করে ধরে নিলেন, বরদা। আবার শুধু বরদা হলেও-বা রক্ষে ছিল, হয়ে গেলাম বরদাচরণ। বললেন, গুড্। আমার নাম হরিচরণ, আপনার নাম বরদাচরণ। গুড্ গুড্। বরদাচরণ কী? বললাম, বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যাপারটা কিন্তু ওইখানেই শেষ হলো না। অনেক দূর গড়ালো। পুলিসে যেদিন আমাকে ধরলে, সেদিন পুলিসকে আমি আমার আসল নামটাই বলতে গেলাম, হরিবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, খবরদার রাস্কেল, নাম ভাঁড়িয়ো না। পুলিসের খাতায় উনিই আমার নামটা লিখিয়ে দিলেন—লিখুন শ্রীবরদাচরণ ব্যানার্জি। ওই নামেই কেস্ চলছে।

আমি কিন্তু এবার জানতে চাইলাম অন্য কথা। আমার কিন্তু ওসব কথা শোনবার মোটেই আগ্রহ ছিল না। আমার শুধু জানবার ইচ্ছা ললিতার কথা। তাই জিজ্ঞাসা করলাম—ললিতার সঙ্গে কেমন করে তোমার পরিচয় হলো তাই বল।

বড়দা বললে, হরিবাবুর চরিত্রটি এখনও তুমি বুঝতে পারলে না?

বোকার মত বললাম, পেরেছি। তিনি মদ বিক্রি করেন।

বড়দা বললে, শুধু মদ নয়। মদ আর মদনানন্দ মোদক। কবিরাজের ডিস্‌পেন্সারী থেকে কিনে আনা মোদকের সঙ্গে খানিকটা বাঁটা সিদ্ধি আর গুড় মিশিয়ে এক সের মোদককে তিন সের করে ছোট ছোট প্যাকেট তৈরি করেন। ছোট প্যাকেট এক আনা, বড় প্যাকেট ছু' আনা। পাড়ার বেপাড়ার যত সব ইস্কুল-কলেজের ছেলেরা চুপি চুপি আসে, জানলার পথে পয়সাটি বাড়িয়ে ধরে, আর হরিবাবু পয়সার বদলে একটি ছুটি মোড়ক তাদের হাতে গুঁজে দেয়। ছেলেরাও কেনে, ছেলের বাবারাও কেনে। কোলকাতায় এই ধরনের কত ব্যবসাই যে চলছে, কে তার খবর রাখছে? হরিবাবুর মত চরিত্রের লোকেরাই সেই সব ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের লোকদের একমাত্র লক্ষ্য, কি করে পয়সা রোজগার করা যায়। পয়সার জন্যে এরা করতে পারে না এমন কাজ বোধহয় ছুনিয়ায় কিছু নেই। কথাটা বুঝতে আমার দেরি হলো না। আমি যখন পকেট থেকে নোট বের করি, হরিবাবু উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকেন। সে যে কি লোলুপ দৃষ্টি, না দেখলে বুঝবে না। আমাদের ঘনিষ্ঠতা তখনও ভাল করে জমেনি, হরিবাবু একদিন বলে বসলেন, মৃত সঞ্জীবনীর এই কারবারটা ভাবছি তুলে দেবো। মদকে মদ তিনি বলতেন না। বলতেন মৃত সঞ্জীবনী। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? বললেন, ক্যাপিট্যাল্ শর্ট পড়ে গেছে। মহাজন আর মাল দিতে চাচ্ছে না। বললাম, কত টাকা হলে চলবে? হরিবাবু বললেন, আপাতত শ'-খানেক।

সেইদিনই একটা চেক লিখে দিলাম।

আমি বললাম, বুঝেছি। সেই রঙ্গলাল মহতোর ব্যাপার।

বড়দা বললে, হ্যাঁ। তারপর থেকেই আমার খাতির গেল বেড়ে। বাইরের ঘরে বসে বসে মদ্যপানটা নাকি নিতান্ত অশোভন, তাই তিনি আমাকে তাঁর অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন। যেতে অবশ্য আমি চাইনি। বলেছিলাম, আপনার স্ত্রী, কন্যা—। আমার কথাটাকে শেষ করতে না দিয়ে তিনি আমাকে টানতে টানতে বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে ডাকলেন, ললিতা!

এই ললিতা নামটি আমি প্রথম শুনলাম।

হরিবাবু বললেন, আমার ওই একটিমাত্র মেয়ে। স্ত্রী অনেকদিন গত হয়েছেন।

একতলা বাড়ি। ছোট ছোট খান-তিনেক ঘর।

ললিতা সাড়া দিচ্ছে না দেখে হরিবাবু আবার ডাকলেন, কি করছিস কি? বেরিয়ে আয়!

ঘরের ভেতর থেকে ললিতা বললে, আমার হাত জোড়া বাবা। কাজ করছি যে!

কী কাজ করছিস?

হরিবাবু ঘরের ভেতর উঁকি মেরে দেখলেন। দেখে বললেন, তা বেশ তো, বরদাবাবু ও-সব জানেন। আসুন বরদাবাবু, ভেতরে এসে বসুন।

এই বলে সেই ঘরটার ভেতর আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন হরিবাবু। বেশ সাজানো ঘর। দুটি জানলাতেই

পর্দা দেওয়া। একটি টেবিল, খানকতক পুরনো চেয়ার, একটি খাট। বুঝলাম এটি ললিতার ঘর।

কিন্তু ঘরের আসবাবপত্র দেখবার সময় তখন আমার কোথায় ?

আমি দেখছি সেই অপরূপ রূপলাবণ্যবতী ললিতাকে। সে তখন গাছ-কোমর বেঁধে কাপড়টা পরে হাঁটু গেড়ে বসে বসে কলাইকরা বড় একটা গামলার ওপর দুহাত দিয়ে ময়দা যেমন করে ঠাসে, ঠিক তেমনি করে একতাল মোদকের সঙ্গে গুড় আর সিদ্ধি মাখাচ্ছে।

বেচারা ললিতা !

কি অসুবিধায় যে সে পড়লো তা' আর বলবার নয়।

নিতান্ত অপরিচিত বয়স্ক এক ভদ্রলোককে বাবা তার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। উঠে দাঁড়াতেও হয়, একটা নমস্কার না করলেও ভাল দেখায় না, অথচ দাঁড়াতে গিয়ে পড়লো বিপদে। এলো খোঁপাটা ফস্ করে গেল খুলে। একপিঠ চুল পিঠময় ছড়িয়ে পড়লো, কোমরের কাপড়টা গেল আলগা হয়ে, হাত দিয়ে যে ঠিক করে নেবে তারও উপায় নেই। দুটো হাতই গুড়ে আর মোদকে জ্যাব্জেবে হয়ে আছে। নিতান্ত অপ্রস্তুতের হাসি হেসে আমার দিকে চোখ তুলে চাইলে ললিতা।

হরিণের মত বড় বড় চোখ, কালো দুটি চোখের তারা—থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ কি দেখে যেন থেমে গেল। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য।

তার পরেই সে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

হরিবাবু বেরিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে বসিয়ে দিয়েই। ঘরে ঢুকলেন তুটো কাঁচের গ্লাস আর এক বোতল মৃত সঞ্জীবনী নিয়ে। বোতল খুলে গ্লাসের ওপর ঢালতে যাচ্ছিলেন, আমি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, থাক্। অন্য ঘরে যাই চলুন।

হরিবাবু হেসে উঠলেন।—মেয়েটার কাছে লজ্জা করছে নাকি? আরে নিন নিন, ওকে আমি এ-সব কাজে এক্সপার্ট করে নিয়েছি। আপনি যদি সারারাত এই ঘরে বসে বসে মদ খান তো ও কিছু বলবে না। উলটে আপনার যত্নআত্তি করবে। সি ইজ এ গুড গার্ল।

লোকটার কথা শুনে আমার সর্বশরীর কেমন যেন রী রী করে উঠলো। বেরিয়ে আসছিলাম ঘর থেকে, হরিবাবু আমার হাতে একটা গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে নিজের গ্লাসটায় মদ ঢেলে ঢকঢক করে খেয়ে ফেললেন। খালি গ্লাসটা হাতে নিয়ে আমি বেরিয়ে আসছি, দোরের কাছে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। ললিতা আসছে। হাতদুটো ভাল করে ধুয়েছে, মাথার চুলগুলো এলোখোঁপা করে জড়িয়ে নিয়েছে, গাছ-কোমরবাঁধা কাপড়টা খুলে আবার পরেছে।

ললিতা আমার পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেল, কিন্তু ভুলেও সে একবার মুখ তুলে তাকালো না। সোজা ঘরে ঢুকে মোদকের পাত্রটা সরিয়ে রাখতে যাচ্ছিল, হরিবাবু বললেন, শোন্। এই যে এই বাবুটিকে দেখছিস—খুব ভাল লোক। আমি বাড়িতে থাকি আর না থাকি, এলে যেন যত্নআত্তি করিস্। নিন্, পাতুন গ্লাসটা।

জানি আমাকে তিনি খাওয়াবেনই। তাঁর মৃত সঞ্জীবনীর দাম তখনও দিইনি। অথচ আধখানা তিনি শেষ করে ফেলেছেন।

গ্লাসটা কিছুতেই পাততে পারছি না। ললিতা একবার তাকালে আমার দিকে।

হরিবাবুর চোখ এড়ালো না। তাঁর শ্যেনচক্ষু এড়ানো বড় শক্ত। মাতাল হলেই দেখি তাঁর দৃষ্টি যেন আরও প্রখর হয়ে ওঠে। বললেন, বুঝেছি। মেয়েটার সামনে খেতে আপনার লজ্জা করছে। চলুন।

আমাকে তিনি পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, এইটে আমার ঘর। আর ওইটে ললিতার। ললিতার সামনে খেতে লজ্জা করবেন না। খাবেন। এক-একটা মানুষ অবশ্য এমনি থাকে—মেয়েদের সামনে একেবারে কেঁচো হয়ে যায়। বিয়ে-থা আপনি করেননি নিশ্চয়ই। তাহ'লে আর মেয়ে-জাতটাকে চিনবেন কেমন করে? বলেই এমন একটা ভ্রূভঙ্গী করলেন, যাতে মনে হল যে, সমস্ত মেয়ে-জাতটাকে তিনি খুব ভাল করেই চেনেন। তাঁর অজানা বুঝি কিছুই নেই।

এমনি-সব নানান্ কথা বলে—মেয়ে-জাতটাকে আমি যাতে ভাল করে চিনতে পারি তিনি তারই ব্যবস্থা করলেন। ব্যবস্থা করলেন ললিতার কাছে আমাকে ভাল করে ভিড়িয়ে দিয়ে।

মেয়ে-জাতটাকে ঠিক চিনলাম কিনা জানি না, তবে হরিবাবুকে আরও ভাল করে চিনলাম।

আর চিনলাম নিজেকে।

মেয়ে-জাতটাকে আমি যে এত ভয় করি সেকথা আগে জানতাম না।

জানলাম সেইদিন—যেদিন ললিতার ভয়ে আমি মদ খাওয়া দিলাম ছেড়ে।

ললিতা বলেছিল, মদ যারা খায় তাদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।—এই বলে সে মদের বোতলটি আমার কাছে নামিয়ে দিয়ে বলেছিল, যান এবার বিদেয় হোন্!

এতো ঘৃণা! কি জানি, এ কদিনেই বোধ হয় ললিতাকে আমি ভালবেসেছিলাম। তাই সেইদিন থেকে আমি মদ ছাড়লাম।

মদ ছাড়লাম, কিন্তু হরিবাবু আমাকে ছাড়লেন না। নানারকম ছলছুতো করে তিনি আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে লাগলেন।

বাড়িভাড়ার দরুন পঞ্চাশটা টাকার জন্যে বাড়ির মালিক একদিন হরিবাবুকে অপমান করে গেলেন আমার চোখের সামনে। সঙ্গে টাকা ছিল না। বললাম, কাল দিয়ে যাব।

এই টাকা দিতে গিয়েই বাধলো গণ্ডগোল।

হরিবাবু বাড়িতে ছিলেন না। ললিতা এসে দোরটা খুলে দিলে। বললাম, মদ খেতে আসিনি ললিতা, আমি এসেছি একটা কাজে।

ললিতার ঘরে গিয়ে বললাম, একটা কাগজ দাও। তোমার বাবাকে একটা চিঠি লিখে দিয়ে যাব।

ছাপা একটি চিঠির কাগজের প্যাড ললিতা আমার হাতের কাছে ধরে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তার এই চলে যাওয়াটা আমার ভাল লাগলো না। ললিতা আমাকে অবিশ্বাস করে। আমি যে আর মদ খাই না সেকথাও হয়ত সে বিশ্বাস করতে পারে না। অন্যমনস্ক হয়ে প্যাডের পাতাগুলো হাত দিয়ে ফড় ফড় করে উলটে যাচ্ছিলাম। দেখলাম, প্যাডের ভেতর একখানা খামের চিঠি। ললিতা বোধহয় লিখেছে কাউকে। খামের ওপর টিকিট নেই। ভাবলাম টিকিট বসিয়ে চিঠিখানা ডাকে দিয়ে দেবো। চুপিচুপি খামখানা নিজের পকেটে রেখে দিলাম।

কলমটা বের করে হরিবাবুকে লিখতে গিয়ে দেখলাম প্যাডের ওপর হরিবাবুর নাম ছাপা। কবিরাজ শ্রীহরিচরণ বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ।

লিখলাম, পঞ্চাশটা টাকা ললিতার হাতে রেখে গেলাম।

—লেখা হলো ?

তাকিয়ে দেখি ললিতা এসে দাঁড়িয়েছে।

তাড়াতাড়ি সেই কাগজের সঙ্গে পাঁচটি দশ টাকার নোট জড়িয়ে ললিতার হাতে দিয়ে বললাম, পঞ্চাশটা টাকা রইলো এর সঙ্গে। তোমার বাবাকে দিও।

উঠে দাঁড়ালাম। হঠাৎ কি মনে হলো, ললিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা বৈদ্য তো ?

ললিতা বললে, বৈদ্য কেন হব ? আমরা ব্রাহ্মণ।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের উপাধি ? তোমার বাবার পুরো নামটি কি ?

ললিতা বললে, শ্রীহরিচরণ চক্রবর্তী।

হরিচরণ চক্রবর্তী! কথাটা ধ্বক্ করে এসে বাজলো আমার বুকে। আমি এক হরিচরণ চক্রবর্তীকে খুঁজছি অনেকদিন ধরে।

কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করলাম ললিতাকে। ললিতা বিশেষ কিছুই বলতে পারলে না।

বাড়ি ফিরে এসে সারারাত আমার ঘুম হলো না। হঠাৎ মনে পড়লো ললিতার সেই খামের চিঠিটার কথা —যে-চিঠি আমি চুরি করে নিয়ে এসেছি ডাকে দেবার জন্যে। চিঠিখানা দেখতে গিয়ে বিপদে পড়ে গেলাম। যাকে লিখছে তার নামটা লেখা আছে শুধু। ঠিকানা নেই।

ছি, ছি, এ আমি করলাম কি?

ভাবলাম চুপিচুপি আবার ফিরিয়ে দিয়ে আসবো চিঠিখানা।

একে ঠিকানা নেই, তার ওপর খামটা বন্ধও করেনি ললিতা।

মেয়েটার হাতের লেখা কেমন দেখতে ইচ্ছে হলো। চিঠি মানুষের মনের ভাব প্রকাশের একটা মস্ত বড় মাধ্যম। মানুষের মন, মানুষের শিক্ষাদীক্ষা সব কিছু ধরা পড়ে এই চিঠিতে। পরের চিঠি পড়া উচিত নয়। তবু পড়ে ফেললাম চিঠিখানা।

ললিতা চিঠিখানা কাকে লিখেছে জানবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম—কাকে লিখেছিল চিঠিখানা?

বড়দা বললে, তা আমি বলবো না। আদালতে শুনবে। চিঠির ভেতর এমন একটা খবর ছিল যা পড়ে মনে হলো ললিতার বাবাই সেই হরিচরণ চক্রবর্তী—যাকে আমি খুঁজে মরছি এতদিন ধরে।

গেলাম হরিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে।

গিয়ে দেখি এক হুলস্থূল কাণ্ড!

সদর দরজাটা হাট হয়ে খোলা। ভেতরে কে যেন ভীষণ চিৎকার করছে। হরিবাবু কিছুতেই তাকে থামাতে পারছেন না। একটু দূরে আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম লোকটা বলছে—'আপনার পেছনে আমি যদি গুণ্ডা লাগিয়ে না দিই তো আমার নাম কিষণলাল নয়!'

হরিবাবু তাকে শুধু এক কথাই বলছেন, আগামী রোববার তুমি এসো—আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে। সেদিন যদি ফিরে যেতে হয় তো তোমার টাকা আমি ফেরত দেবো।

শেষ পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই ঠিক রইলো। লোকটা বললে, টাকা আমি ফেরত চাই না, আমার কাজটা ঠিক হলেই হলো। ললিতা দেবীকে বলে রাখবেন।

এই বলে লোকটা থামলো।

জুতোর শব্দ শুনে বুঝলাম সে আসছে। লুকিয়ে দাঁড়ালাম বাইরের ঘরে। দেখলাম, অবাঙ্গালী এক প্রিয়-দর্শন যুবক। সাজপোশাক দেখে মনে হলো বড়লোকের ছেলে। ছিঃ ছিঃ! হরিবাবু কি মানুষ? বাবা হয়ে মেয়েকে এইভাবে···

সে যেই হোক, আমার দেখবার প্রয়োজন নেই। আমার দরকার হরিবাবুর সঙ্গে। ভাবছি—এ সময় তাঁর কাছে যাওয়া আমার উচিত হবে কিনা। এমন সময় কানে এলো একটা চাপা কান্নার আওয়াজ। মনে হলো যেন ললিতা কাঁদছে।

সঙ্গে সঙ্গে হরিবাবুর তিরস্কার!—'আমার কথা না শুনলে তোকে আমি খুন করে ফেলবো। হতভাগা মেয়ে! আর করবি? আর করবি? আর করবি? মেয়ে আমার সতী হতে এসেছে!'

চাপা কান্নার শব্দ আর মারের আওয়াজ যেন বেড়েই চললো। কি বিপদে যে পড়লাম তা আর বলবার নয়। এ সময় কাছে গেলে ললিতা হয়ত লজ্জা পাবে। অথচ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকাও অসম্ভব।

ললিতা কী যেন বললে।

হরিবাবু চিৎকার করে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারী একটা আওয়াজ আর ললিতার আর্তনাদ!—'বাবা!'

মেরেই ফেললে নাকি মেয়েটাকে?

ছুটে চলে গেলাম ভেতরে। ডাকলাম, হরিবাবু!

হরিবাবু চমকে উঠলেন। ফিরে তাকিয়েই বললেন, আপনি কোত্থেকে এলেন?

দেখলাম ললিতা দুহাত দিয়ে তার কপালটা চেপে ধরে ঘরের ভেতর সরে গেল। হরিবাবুকে টেনে আনলাম সেখান থেকে। হরিবাবু তখন হাঁপাচ্ছেন।—'বললে

কথা শোনে না হতভাগা মেয়ে! দেখতেই অমনি! বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে নেই।'

বলতে বলতে তিনি পাশের ঘরে এসে বসলেন। বললেন, চলবে নাকি? আনবো মৃত সঞ্জীবনী?

বললাম, না। আমি ছেড়ে দিয়েছি।

হরিবাবু হাসলেন। বললেন, ছাড়া! অত সহজ নয় বরদাবাবু, দুদিনের শ্মশানবৈরাগ্য। তিন দিনের দিন আবার খাবেন। তখন আর কম-কম খেলে চলবে না। বেশী খেতে হবে। লাভের মধ্যে এই তো হবে লাভ।

দিব্য সহজ মানুষের মত কথা বলতে লাগলেন হরিবাবু। এতক্ষণ যে ব্যাপারটা হয়ে গেল সেটা যেন কিছুই নয়। আমার কথাটা কেমন করে পাড়বো তাই ভাবছি। বললাম, আপনি খাবেন তো খান, আমি টাকা দিচ্ছি।

খুব খুশী হয়ে উঠলেন হরিবাবু। বললেন, আপনারই তো খাচ্ছি মশাই। কই, বের করুন টাকাটা। আমাকে আবার হিসেব রাখতে হয়।

দশ টাকার একখানি নোট বের করে তাঁর হাতে দিলাম।

হরিবাবু বললেন, খুচরো নেই।

বললাম, না থাক্। রাখুন নোটখানা।

কাঁচের একটা গ্লাসে ঢেলে মৃত সঞ্জীবনীটুকু বেশ মনের আনন্দেই পান করছেন হরিবাবু, এমন সময় কথাটা পাড়লাম। বললাম, আচ্ছা হরিবাবু, বরানগরের অতুল চ্যাটার্জিকে আপনি চিনতেন? অনেকদিনের কথা বলছি।

গ্লাসের শেষ তলানিটুকু খেয়ে নিয়ে হরিবাবু বললেন, না। কোথায় তিনি ?

বললাম, তিনি মারা গেছেন। আমি তাঁর কাছ থেকে শুনেছিলাম তাঁর এক বিশিষ্ট বন্ধু আছেন টালিগঞ্জে, নাম হরিচরণ চক্রবর্তী। তাই জানতে চাইছিলাম আপনিই সেই হরিচরণ চক্রবর্তী কিনা!

হরিবাবু আবার তাঁর গ্লাস ভরতি করলেন। বললেন, আজ্ঞে না। সে অন্য লোক। এক নামে কত লোক থাকতে পারে। তাছাড়া—

বলেই গ্লাসটুকু আবার শেষ করলেন তিনি। এবার শেষ করলেন খুব তাড়াতাড়ি। বললেন, চক্রবর্তী তো আমাদের উপাধি নয়, আমরা আসলে চট্টোপাধ্যায়—কাশ্যপ গোত্র। দেখবেন আমার লেটার হেডে ওই জন্যে আমি শুধু আমার ইয়েগুলো ছেপে দিয়েছি। বিদ্যাবিনোদ, কাব্যতীর্থ এই সব।

বড় কঠিন ঠাঁই। বুঝলাম সহজে ধরা দেবে না লোকটা। আবার এমনও হতে পারে, হয়ত-বা আমারই ভুল। হয়ত-বা এ-লোক সে-লোক নয়।

কিন্তু আমার সেই চুরি করে আনা ললিতার চিঠিখানি আমাকে সাহায্য করলে খুব। তাতে একটি মেয়ের নাম ছিল—কিরণশশী দেবী। নাম ছিল, ঠিকানা ছিল। তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করতেই আমার সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল।

আমার মনে হলো হরিবাবুকে একবার আদালতে নিয়ে

যাওয়া উচিত। আদালতের বাইরে তিনি কোনও কথাই স্বীকার করতে চাইবেন না। আর তা স্বীকার করিয়েও কোনও লাভ নেই। কিন্তু কেমন করে নিয়ে যাব—নিয়ে গিয়ে কি বলবো, নিজেই শেষে অপ্রস্তুত হব কিনা এই সব কথাই ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ একদিন গিয়ে শুনলাম—হরিবাবু বাড়িটা বদলে অন্য কোথায় চলে যেতে চাচ্ছেন।

আমি আর কিছুতেই স্থির থাকতে পারলাম না। যা হয় তাই হবে।

দেখলাম, বড় রাস্তার মোড়ে হরিবাবু আসছেন। চট্ করে তাঁর বাড়িতে ঢুকে গিয়ে ডাকলাম, ললিতা! ললিতা!

ধরিত্রীর মত সর্বংসহা ললিতা—রান্নাঘরে কি যেন করছিল, বেরিয়ে এসে বললে, কি বলছেন?

—তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসো, যেমন আছ তেমনি। তোমার বাবা রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়েছেন।

ললিতা ছুটে এসে দাঁড়ালো আমার কাছে।

এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে তাকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়।

হরিবাবুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। দেখা হবে জানি। চমৎকার অভিনয় করলাম।

ললিতা ভাবলে, আমি বুঝি তার বাবার চেয়েও বড় শয়তান। কিন্তু আশ্চর্য, তার মুখের চেহারা এতটুকু বদলালো না। আমাকে ভর্ৎসনা করলে না, তিরস্কার করলে

না, গালাগালি দিলে না। কাঠ হয়ে শুধু দাঁড়িয়ে রইলো দোরের কাছে।

চেঁচিয়ে লোক জড়ো করলেন হরিবাবু। খুব চেঁচামেচি গোলমাল উঠলো।

সবাই আমাকে ছিছি করতে লাগলো।

ক্রুদ্ধ জনতা আমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে পারতো। কিন্তু কেন জানি না, আমার গায়ে কেউ হাত তুললে না। হরিবাবু অবশ্য বলতে কিছু বাকী রাখলেন না। এ-ক্ষেত্রে যা বলা উচিত সবই বললেন। বললেন, মানুষকে আজকাল চেনা বড় দায় হয়ে উঠলো দেখছি। কলিকাল কিনা! ধম্মকম্ম সব গেল।

বেশ ভাল ভাল কথা তিনি অনর্গল বলে যেতে লাগলেন। কিন্তু বরাবর লক্ষ্য করলাম—আমার মুখের দিকে তাকাবার মত জোর যেন তিনি পাচ্ছিলেন না। হয়ত-বা এমনি দু'চার কথা বলেই তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করে দিতে পারতেন। পারলেন না শুধু পাড়াপ্রতিবেশীর জন্যে। আমার মত দুর্জনের শাস্তি পাওয়াই উচিত বলে তাঁরা আমাকে আটকে রেখে থানায় খবর দিলেন।

তারপর যা হয়েছে সবই তো তুমি জানো।

হোটেল থেকে বেরিয়ে গল্প করতে করতে আমরা গড়ের মাঠে গিয়ে বসেছিলাম।

বললাম, তুমি বোধহয় জানো না বড়দা, আমার দাদা

একজন নাম-করা উকিল.। তোমাকে এক্ষুনি একবার যেতে হবে আমার সঙ্গে।

বড়দা শুনে বললে, কি হবে রে ভাই। উকিল বোধ হয় খুব একটা দরকার হবে না।

আমি বললাম, তা হোক, মামলার ব্যাপার। কোথা থেকে কি যে হয়, তার ঠিক নেই।

বড়দা একটু অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভেবে নিলে। তারপরে বললে, হরিবাবুর মুখোস খোলাবার জন্যে যখন এত দূর এগোলাম, তখন চল, দেখাই যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়!

বড়দাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এলাম।

আদালতে আবার মামলা শুরু হলো।

আসামীর এবার আত্মপক্ষ সমর্থনের পালা। লোকে লোকারণ্য আদালত-ঘর। বহু লোক এসেছে মামলা শুনতে।

আমি বসে আছি এক পাশে। আজ ললিতা আসবে। ললিতাকে দেখবো—এই আমার একমাত্র আশা।

হঠাৎ চারিদিকে মৃদু গুঞ্জন উঠলো। তাকিয়ে দেখলাম, আমার দাদা আসছে। আমার দাদা এখানকার নাম-করা উকিল। অমরবাবুকে সবাই চেনে।

প্রথমেই এক নম্বর সাফাই সাক্ষী শ্রীহরিচরণ বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থকে ডাকা হলো। হরিবাবু আজ বেশ সেজেগুজে এসেছেন। রঙীন একটি শার্টের ওপর কোট

গায়ে দিয়েছেন। কোটের ওপর আধময়লা একটি সিল্কের চাদর ঝুলছে। পায়ে ফিতেবাঁধা বুট জুতো।

হলফ পাঠ হয়ে যাবার পর দাদা উঠলো। হাকিমকে যা বলবার বলে হরিবাবুর কাছে গিয়ে বললে, দেখুন, আপনাকে এমন কোনও কথা আমি জিজ্ঞাসা করবো না যাতে আপনার সম্মানের হানি হয়। কাজেই আমি যা বলবো, নিঃসংকোচে এবং নির্ভয়ে আপনি তার জবাব দিয়ে যান।

হরিবাবু বললেন, বলুন।

আঙুল বাড়িয়ে বড়দাকে দেখিয়ে দাদা জিজ্ঞাসা করলে, আসামীকে আপনি চেনেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, চিনি।

—উনি আপনার যুবতী কন্যাকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে পালাচ্ছিলেন? ছি, ছি, মেয়ের বয়সী একটা মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে পালিয়ে যাওয়া—অত্যন্ত অন্যায়। আচ্ছা কি হয়েছিল বলুন তো!

হরিবাবু বললেন, উনি বাইরে থেকে এসে ছুটতে ছুটতে আমার মেয়েকে গিয়ে বলেন, তুমি যেমন আছ তেমনি অবস্থায় চলে এসো। তোমার বাবা গাড়িতে চাপা পড়েছেন। তাই না শুনে আমার মেয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে আসে ওর সঙ্গে।

দাদা বললে, ছি ছি, আসামীর এত বয়েস হলো, আর এটুকু বুদ্ধি হলো না যে, গাড়ি-চাপা অবস্থায় আপনাকে যখন সে দেখাতে পারবে না তখন কি হবে? মেয়েটা তখন যাবে কেন তার সঙ্গে? যাক্, তারপর কি হলো?

হরিবাবু বললেন, যেই ওরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, আমার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

—আপনি বাড়ি ফিরছিলেন বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ট্রাম থেকে নেমে আমি সোজা বাড়ি আসছিলাম।

দাদা বললে, আপনার বাড়ি থেকে ট্রাম-রাস্তাটা কতদূর?

হরিবাবু বললেন, তা মিনিট-পাঁচ-সাত হাঁটতে হয়। একেবারে নাকের সোজা।

—আপনার বাড়ির দরজায় দাঁড়ালে ট্রাম-রাস্তাটা দেখা যায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

দাদা বললে, তাহলেই দেখুন, আপনি যখন ট্রাম থেকে নেমে আধখানা পথ চলে এসেছেন, তখন আসামী আপনার বাড়ি ঢুকছে। ঢুকছে কি ভেবে? না, আপনার মেয়েকে বলবে—আপনি গাড়িতে চাপা পড়েছেন। অথচ বাড়ি ঢোকবার আগে নাকের সোজা রাস্তাটার দিকে একবার তাকালে না। কত বড় বোকা হলে এই কাজ করে ভাবুন। আসামী হয় অত্যন্ত বোকা আর নয়ত তার অন্য কোনও মতলব ছিল। তার ওপর শুনছি নাকি পুলিসের কাছে সে নাম ভাঁড়িয়ে অন্য নাম বলতে চেয়েছিল। আপনিই সেটা ঠিক করে দিয়েছিলেন। কথাটা সত্যি?

হরিবাবু বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। পুলিসের ডাইরিতে সেটা আমি নোট করিয়ে দিয়েছি।

দাদা বললেন, খুব ভাল কাজ করেছেন। কী নাম সে বলতে চেয়েছিল, পরে প্রয়োজন হলে পুলিসকে আমি জিজ্ঞাসা করবো। যাক সেকথা, এই নাম নিয়ে বড় গোলমাল হয়। আমার তো ছাই মনেই থাকে না নাম-টাম।

এই বলে দাদা একখানি সাদা কাগজের প্যাড আর নিজের ফাউণ্টেন কলমটি হরিবাবুর হাতের কাছে ধরে দিয়ে বললে, এইখানে লিখুন তো—বাংলায় আপনার নামটি লিখে রাখুন!

হরিবাবু লিখলেন।

কাগজখানি তুলে নিয়ে দাদা দেখলে। দেখে বললে, না না, হরিচরণ বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ বললে আপনি ব্রাহ্মণ কি বৈদ্য কি শূদ্র কিছুই বুঝতে পারছি না! আপনার উপাধিটি লিখুন।

লিখবার আগে হরিবাবু বললেন, আমাদের আসল উপাধি চট্টোপাধ্যায়, আমরা কাশ্যপ গোত্র। এই বলে তিনি লিখলেন।

কি লিখলেন কিছু না দেখেই লেখাটি দাদা হাকিমের হাতের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললে, এটা এইখানে থাক। বলেই দাদা আবার এলো হরিবাবুর কাছে এগিয়ে। বললে, এইবার বলুন—কয়েকটি কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দিন। বেশ ভাল করে স্মরণ করুন, আপনি হাওড়ায় গেছেন কোনোদিন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, গেছি।

—বেলেঘাটা ?

—গেছি।

—তাহলে বরানগরে নিশ্চয়ই গেছেন।

—গেছি।

—গোপাললাল ঠাকুর রোড কোথায় জানেন ?

এইবার থামতে হলো হরিবাবুকে। খুব চালাক লোক। ঝট্ করে বলে বসলেন, আজ্ঞে না। নামও কোনোদিন শুনিনি।

দাদা বললে, তাহলে আপনি বরানগরের গোপাললাল ঠাকুর রোডের নাম কোনোদিন শোনেননি। আচ্ছা, মনে করে দেখুন তো—অতুল চ্যাটার্জি বলে কোনও লোককে আপনি কোনোদিন চিনতেন কিনা ?

হরিবাবু বললেন, আজ্ঞে না, মনে পড়ে না।

দাদা হাকিমের দিকে তাকিয়ে তাঁকে নোট করিয়ে দিলে, হরিবাবু বরানগরের গোপাললাল ঠাকুর রোডের অতুল চ্যাটার্জিকে চিনতেন না কোনোদিন। এইবার বলুন—আপনি টালিগঞ্জে কোনোদিন ছিলেন কি না!

—আজ্ঞে না। কস্মিন কালে না।

—আপনার স্ত্রী আছেন ?

—আজ্ঞে না, মারা গেছেন।

—আপনার ছেলেমেয়ে কতগুলি ?

হরিবাবু বললেন, ওই একটিমাত্র মেয়ে। ললিতা।

—ছেলেবেলায় ওকে কি বলে ডাকতেন ?

—ললিতা বলেই ডাকতাম।

দাদা আবার হাকিমকে নোট করিয়ে দিলে কথাগুলো। বিশেষ করে ওই কথাটা। ওঁর ওই একটিমাত্র মেয়ে—ললিতা। আর ওর ডাক্-নাম কিছু ছিল না।

দাদা আবার আরম্ভ করলে। বললে, আর বেশী কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করব না। শুধু বলুন, আপনার স্ত্রী যখন মারা গেলেন, আপনার ওই কন্যার বয়স তখন কত?

হরিবাবু বললেন, তা বছর-তিনেক হবে।

দাদা চুক্‌চুক করে জিব দিয়ে একরকম শব্দ করলে।

—আহা বেচারা! তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে আপনি খুব কষ্টে পড়েছিলেন বলুন!

হরিবাবু বললেন, হ্যাঁ, একটা ঝি রেখেছিলাম ওকে মানুষ করবার জন্যে।

—ঝির নামটি আপনার মনে আছে?

হরিবাবু কেমন যেন একটুখানি চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। বললেন, কিরণশশী না কি—এই রকম একটা নাম।

দাদা আবার হাকিমের দিকে তাকালে। হাকিম বললেন, আপনি কাজ করে যান। আমি সব 'নোট' করছি।

দাদা জিজ্ঞাসা করলে হরিবাবুকে, ঝিকে কত টাকা মাইনে দিতেন?

হরিবাবু বললেন, আগেকার দিন তো! দশ পনেরো টাকা দিতাম।

—ঝি আপনার বাড়িতেই থাকতো?

হরিবাবু ভেবে বললেন, হ্যাঁ, তা থাকতো।

দাদা বললেন, বসুন আপনি। আর আমার কিছু জিজ্ঞাসা করবার নেই।

হরিবাবু বসলেন।

দাদা বললে, এইবার কিরণশশী দেবীকে ডাকা হোক।

কথাটা শুনেই হরিবাবু উঠে মাথা নীচু করে চুপিচুপি পালিয়ে যাচ্ছিলেন। দাদার চোখ এড়ালো না। বললে, না হরিবাবু, আপনি এখন যেতে পারবেন না। বসুন চুপটি করে। শেষ পর্যন্ত দেখুন মামলায় কি হয়? তারপর আপনার ঝিই বা কি বলে—শুনুন।

হরিবাবু বললেন, আমার মেয়ে—

দাদা বললে, আপনার কোনও চিন্তা নেই। পুলিস পাহারা আছে।

কিরণশশী এসে দাঁড়ালো। গায়ের রং কালো, বয়সও খুব কম নয়, কিন্তু স্বাস্থ্যবতী। মুখে বসন্তের দাগ না থাকলে সুন্দরী বলা চলতো।

হলফ পাঠ শেষ হতেই দাদা তার কাছে গিয়ে বললে, আপনাকে কয়েকটি কথা আমি জিজ্ঞাসা করব মা, আপনি ভেবেচিন্তে জবাব দিন। কাউকে ভয় করবেন না। যা সত্য তাই বলুন। আপনি কবিরাজ শ্রীহরিচরণ বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থকে চেনেন?

কিরণশশী বললে, কোবরেজ কেন হবে? সে তো দালাল।

—কিসের দালালি করেন তিনি ?

কিরণশশী চুপ করে রইলো।

দাদা জিজ্ঞাসা করলে, জানেন না ? থাক তাহলে।

—থাকবে কেন ? কিন্তু সে-সব যে বড় নোংরা ব্যাপার বাবা। মুখ দিয়ে বেরোতে চাইছে না। টাকার জন্যে এমন কাজও মানুষে করে ?

—দরকার নেই। আপনি তাঁর পুরো নামটি বলুন।

কিরণশশী বললে, হরিচরণ চক্কোত্তি।

দাদা হাকিমের দিকে তাকাল। হাকিম মাথাটা কাত করে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন—চালিয়ে যান।

দাদা জিজ্ঞাসা করলে, হরিচরণবাবুর বাড়িতে আপনি ঝিএর কাজ করতেন ? দশ-বারো টাকা মাইনে পেতেন ?

কিরণশশী অবাক্ হয়ে গেল। গালে হাত দিয়ে বললে, ও মা, এই সব কথা বলেছে বুঝি ? শয়তান কোথাকার ! মুখে কিছু বাধে না ? এখনও চন্দর-সূয্যি উঠছে, মাথার ওপর ভগবান আছেন, মুখপোড়ার কি ভয় নেই কিছুতে !

—গালাগালি দেবেন না মা। আপনি তাহলে ঝি ছিলেন না ?

কিরণশশী জোর গলায় বললে, না। ঝিএর কাজ আমি ওর বাড়িতে করিনি, তবে ওরই জন্যে অন্য বাড়িতে কাজ করতে আমি বাধ্য হয়েছি। আমার পোড়া অদেষ্ট, ললাটের লেখন, তাই আমি ওইরকম একটা হতচ্ছাড়ার খপ্পরে গিয়ে পড়েছিলাম। মা বাবা মরে গেল, আমার তখন

বয়েস কম, পিসতুতো এক দিদির কাছে গিয়ে রইলাম। দিদি একদিন এক মাতাল বুড়োর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দিলে। সেই বুড়োর কাছে যেতো ওই হরিবাবু।

দাদা জিজ্ঞাসা করলে, কেন যেতো ?

—যেতো গাঁজা খেতে। হরিবাবুর তখন ছোকরা বয়েস। আমার স্বামী একদিন মরে গেল। আমার তখন চারদিক অন্ধকার। না বললে অধর্ম্ম হবে। হরিবাবু তখন আমার খুব করেছিল। সেই হলো আমার কাল। হরিবাবুর কথায় ভুলে তার সঙ্গে আমি চলে গেলাম। দূরের একটা বস্তিতে নিয়ে গিয়ে একটা ঘর ভাড়া করে দিলে।

দাদা জিজ্ঞাসা করলে, দুজনে একসঙ্গেই থাকতেন ?

কিরণশশী বললে, না। আমি থাকতাম ভবানীপুরে আর ও থাকতো কালীঘাটে, তারপর ও চলে গেল টালিগঞ্জে। রোজ আসতো আমার কাছে। দু' চার টাকা দিয়ে যেতো। তাই দিয়ে নিজে চারটি রান্নাবান্না করে খেতাম। আমি বলতাম, কোনও বড়লোকের বাড়িতে আমার একটা কাজকর্ম্ম করে দাও। এরকম করে থাকতে আমার ভাল লাগে না। ও শুধু মুখেই বলতো, দেবো। এমনি করে চার-পাঁচ বছর কাটলো। ধীরে ধীরে আমার কাছে আসা কম করে দিলে, টাকাও যা দিতো তাতে একটা পেটও চালাতে পারতাম না। ওর আশায় থেকে থেকে এমন দিনও গেছে—উপোস করে কাটিয়েছি। ঝগড়া হতে লাগলো আমাদের। আমি শুধু কান্নাকাটি করতাম আর ভগবানকে ডাকতাম। এমন দিনে দুম্ করে একটা বছর-

তিনেকের মেয়ে এনে আমার কোলে দিলে ফেলে। বললে, এই নাও, একে মানুষ কর।

দাদা জিজ্ঞাসা করলে, কার মেয়ে?

কিরণশশী বললে, কেমন করে জানবো বাবা?

—হরিবাবুকে জিজ্ঞাসা করেননি?

—করেছিলাম। কিন্তু ও কি সত্যি কথা বলতো আমার কাছে? বলতো, ওর নিজের মেয়ে। বৌ মরে গেল তাই তোমার কাছে নিয়ে এলাম।

দাদা জিজ্ঞাসা করলে, আপনার কি মনে হতো?

কিরণশশী বললে, সে আর শুনে কি করবে বাবা? তিন বছরের মেয়ে বাপ চিনতো না। মেয়েটাকে শেখালাম —আমি মা, আর ও বাবা। মেয়েটাকে পেয়ে হাতে আমি সগ্‌গো পেলাম। মিছে কথা বলবো না বাবা, মেয়েটাকে ও এমনি দেয়নি। একবার দিলে নগদ তিনশ' টাকা, আর একবার দিলে একশ' টাকা।

—এই শেষ? আর দিলে না?

—দেবে! বাবু যে তখন ফুর্তি করছেন! জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এত টাকা তুমি কোথায় পেলে? ও বলেছিল, বৌটা চুরি করে জমিয়েছিল। মরে যেতেই দেখি—বাক্সোয় মেলা টাকা। কিন্তু তার'পর থেকেই আসা ওর একেবারে কমে গেল। আমি মেয়েটাকে পেয়ে সব-কিছু ভুলে রইলাম।

—আপনাদের মা-মেয়ের চলতো কেমন করে? চারশ' টাকা আর কতদিন?

—যতদিন টাকা ছিল ততদিন কিছু ভাবিনি। তার পরে ভাবতে হলো। আমি না খেয়ে দুদিন কাটিয়ে দিতে পারি, কিন্তু আমার মেয়ে তো পারে না। তার জন্যেই আমাকে বেরুতে হলো—বাবুদের বাড়ির দরজায়। তিন চারদিন পরে একটি চাকরি পেয়ে গেলাম। ঝিএর চাকরি, তবে নেহাত বাসন-মাজা ঝি নয়।

দাদা বললে, থাক আর বলতে হবে না। এখন বলুন তো দেখি—মেয়েটিকে কি বলে ডাকতেন ?

—মেয়ে যখন এলো, তখন ও বলতো, আমার নাম লিলি।

দাদা বললে হাকিমের দিকে তাকিয়ে।—ইওর অনার মে প্লিজ নোট ইন্ বোল্ড লেটার্স। লিলি। মেয়ের ডাক-নাম লিলি। পরে হয়েছে ললিতা।

এই বলেই দাদা আবার ফিরে দাঁড়ালো কিরণশশীর দিকে। জিজ্ঞাসা করলে, ললিতা আপনার কাছ থেকে হরিবাবুর কাছে গেল কখন ?

—আমারই দোষে গেল বাবা। বললাম তো—আমার কপাল বড় খারাপ। আজ পাঁচ বছর আমার ললিতাকে আমি দেখিনি। এইটুকু মেয়েকে নিজের মেয়ে বলে গায়ের রক্ত জল করে আমি তেরো বছরেরটি করে তুলেছিলাম। তারপর—

বলতে বলতে কিরণশশীর ঠোঁটদুটি থরথর করে কাঁপতে লাগলো। চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে এলো। চোখের জল মুছতে মুছতে সে বলতে লাগলো ঃ আমার

হলো বসন্ত। ছোঁয়াঘাঁটা করলে পাছে ওর কিছু হয় তাই ওকে তখন আমি বাবুদের বাড়িতে সরাতে চাইছিলাম। কিন্তু আমার তখন বিছানা ছেড়ে ওঠবার ক্ষমতা নেই। কি করবো ভাবছি আর ঠাকুরকে ডাকছি দিনরাত। ললিতাকে বললাম, বাবুদের বাড়ি তুইই না হয় একবার যা মা। গিন্নীমাকে আর বড় বৌঠাকরুনকে আমার নাম করে গিয়ে বল্। ললিতা কিছুতেই যায় না। বলে, আমার কিচ্ছু হবে না মা, তুমি থামো। আমি চলে গেলে তোমার সেবাযত্ন করবে কে? এমন দিনে হরিবাবু একদিন এলো। তিন মাস পরে এলো। বাবুর তখন অবস্থা খুব খারাপ। আমারই কাছ থেকে বাবু মাঝে মাঝে দু'চার টাকা নিয়ে যায়। আমি বললাম, এই তো আমার অবস্থা। মেয়েটাকে কাছে রাখতে ভয় করছে। ওর যদি মায়ের দয়া হয় তো কি হবে আমি ভাবতেই পারছি না। তুমি ওকে নিয়ে যাও। মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে গেল ওর বাপের সঙ্গে। কিন্তু তখন কি আর জানি—সেই যাওয়াই ওর শেষ যাওয়া হবে। সেই যে গেল—আজও গেল কালও গেল। না পেলাম হরিবাবুর পাত্তা, না পেলাম ললিতার। আমি যদি তখন মরে যেতাম তাহলে খুব ভাল হতো বাবা।

ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো কিরণশশী। সে কান্না আর থামে না কিছুতেই।

দাদা বললে, থাক, আর আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আপনি বসুন।

বসবার আগে কিরণশশী আবার বললো, হ্যাঁ বাবা, ললিতাকে দেখবো বলে আমি এখানে এসেছি। তাকে একটিবার দেখতে পাব না ?

দাদা বললে, পাবেন দেখতে। আপনি বসুন।

এবার ললিতার পালা।

এলো ললিতা। সারা আদালত হাঁ করে তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে। তার কপালের দাগটা এখনও মিলিয়ে যায়নি। আরও সুন্দরী মনে হচ্ছে ললিতাকে। পরনে সাধাসিধে একখানি রঙিন শাড়ি। হাতে মাত্র দু' গাছি সোনার চুড়ি। কানে দুটি সাদা পাথর। ও দুটি সে ফিরিওলার কাছ থেকে কিনেছিল আমাদের পাড়ায় থাকতে। আমি জানি।

সস্তা সে পাথরদুটি হীরের মত জ্বলছে।

কারও দিকে না তাকিয়ে ললিতা এগিয়ে গেল। সাক্ষীর কাঠগড়ায় একটি চেয়ার দেওয়া হয়েছিল, দাদা বললে, বোসো মা, বোসো ওইখানে।

ললিতা বসলো।

ওদিকে তাকে যখন হলফ করানো হচ্ছে, এদিকে কিরণশশী তখন উঠে দাঁড়ালো।

দাদা দেখতে পেয়ে তার কাছে এলো।—'কিছু বলবেন ?'

—ললিতার কাছে আমি যাব বাবা ?

দাদা বললে, না মা। এখন না। এক্ষুনি আমি ছেড়ে দেবো ওকে।

এই বলে দাদা এগিয়ে গেল ললিতার কাছে। সাদা কাগজের প্যাড আর কলমটি তার হাতে দিয়ে বললে, এইতে তোমার নামটি লেখো তো মা!

ললিতা লিখলে।

—এইবার তোমার বাবার নামটি লেখো। কবিরাজ-টবিরাজ লিখো না। যা নাম তাই লিখবে।

লেখা শেষ হলে কাগজটি হাকিমের হাতে দিয়ে দাদা আবার ললিতার কাছে ফিরে এলো। আঙুল বাড়িয়ে আসামীর কাঠগড়ায় বড়দাকে দেখিয়ে বললে, ওঁকে তুমি চেনো?

মাথাটি কাত করে ললিতা বললে, হ্যাঁ চিনি।

—উনি তোমাকে কি বলেছিলেন?

—বলেছিলেন, তোমার বাবা গাড়ি চাপা পড়েছে, তুমি এসো।

—তুমি কি করেছিলে?

—আমি তক্ষুনি ছুটে গিয়েছিলাম।

—তারপর দোরের কাছেই তোমার বাবার সঙ্গে যখন দেখা হয়ে গেল' তুমি অবাক্ হয়ে যাওনি তোমার বাবাকে দেখে?

—হয়েছিলাম। কিন্তু তার চেয়েও বেশী অবাক্ হয়েছিলাম—

বলেই ললিতা একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালে

বড়দার দিকে। কি যেন বলতে গেল, কিন্তু বলতে পারলে না।

দাদা বললে, থামলে কেন ? কি বলছিলে বল।

ললিতা বললে, মনে হয়েছিল, উনি যেন এইটিই চাচ্ছিলেন।

দাদা জিজ্ঞাসা করলে, উনি কি তোমার সঙ্গে কোনো-দিন খারাপ ব্যবহার করেছিলেন ?

ললিতা বললে, কখ্খনো না।

—তোমার কি মনে হয়—লোকটা খুব খারাপ ?

জবাবে কোনও কথা বললে না ললিতা। শুধু মাথাটি এদিক ওদিক নেড়ে জানিয়ে দিলে—'না।'

—তোমাকে উনি কোনোদিন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তোমার বাবার নাম কি ?

ললিতা বললে, করেছিলেন। বাবার ছাপা চিঠির কাগজের প্যাডখানা দেখে বলেছিলেন, তোমার বাবা তো কবিরাজ। তোমরা তো বৈদ্য ? আমি বলেছিলাম, না আমরা বৈদ্য নই। আমরা ব্রাহ্মণ। আমার বাবার নাম শ্রীহরিচরণ চক্রবর্তী।

—তার পর ?

—তার পর আর-কি ! তারপরেই তো এই ব্যাপার।

দাদা জিজ্ঞাসা করলে, কিরণশশী দেবীকে তুমি চেনো ?

ললিতা বললে, চিনি। আমার মা।

এই বলে সে চোখ তুলে তাকালে। তার চোখ যেন

খুঁজে বেড়াতে লাগলো তার মাকে। বললে, মা এসেছে আমি দেখেছি।

কিরণশশী তো প্রথম থেকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল ললিতার দিকে। চোখে চোখ পড়তে দেরি হলো না। কিন্তু তখন আর কে কাকে দেখবে! দুজোড়া চোখই তখন জলে ভরা!

দাদা সেটা লক্ষ্য করলে। আর সেই জন্যই বোধকরি সে এই পবিত্র মুহূর্তটিকে নষ্ট করতে চাইলে না। হাকিমের দিকে তাকাতেই দেখা গেল, রুমাল দিয়ে তিনি তাঁর চশমাটা মুছছেন। দাদাকে কি যেন তিনি বললেন. দূর থেকে ভাল শোনা গেল না।

দাদা ললিতার কাছে এগিয়ে এলো। বললে, যাও তুমি মার কাছে গিয়ে বোসো গে! যাবার আগে শুধ্ বলে যাও—ছোটবেলায় তোমার কোনও ডাক-নাম ছিল কি না!

ললিতা তখন কিরণশশীর কাছে যাবার জন্য উদ্‌গ্রীব। মুখে ম্লান একটু হাসির রেখা, চোখে জল। কি যে বললে কিছুই বুঝা গেল না। অস্ফুট কণ্ঠে শুধ্ ডাকলে, মা!

ওদিকে কিরণশশী তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। ভুলে গেছে এটা আদালত। ভুলে গেছে—পুলিস তাকে জোরে কাঁদতেও মানা করে দিয়েছে। সব কিছু ভুলে গিয়ে সে চিৎকার করে উঠলো, লিলি! ললিতা!

ললিতাও ছুটে এলো কিরণশশীর কাছে।

কান্নাকাতর কণ্ঠে ডাকলে, মা!

বলেই সে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার মার বুকের ওপর।

নিজের মা নয় ললিতার। কিরণশশীরও নিজের মেয়ে নয়। কিন্তু তবু তারা দিলে কাঁদিয়ে সারা আদালতটাকে।

মামলার বিচার দেখতে যারা এসেছিল তাদের সকলের চোখে জল অবশ্য এলো না, কিন্তু দেখা গেল, অনেকেই তখন চোখ মুছছে।

ওদিকে আসামীর কাঠগড়ায় একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়ে বড়দা দাঁড়িয়ে।

আমি তখন ভাবছি, বড়দা অমন করে এদিকে চেয়ে আছে কেন? কেনই বা সে হরিবাবুর কাছে ধরা দিল? এমন একটা জঘন্য মামলায় সে নিজেকে জড়িয়েই বা ফেলল কেন? কিছুই বোঝা যায় না এই পৃথিবীতে! মানুষের চরিত্রই বিচিত্র! কারোর সঙ্গে কারোরই মিল হয় না।

মামলা তখনও শেষ হয়নি। আমার দাদা বললে, উকিলদের সেন্টিমেণ্ট্যাল হলে চলে না।

বলেই সে হাকিমের কাছে গিয়ে যেন কিসের অনুমতি চেয়ে নিল। বললে, তোমরা দু' মা-মেয়ে এখন বাইরে যেতে পার। যাও তোমরা বাইরে যাও।

এই বলে মা ও মেয়েকে বিদায় করে দিয়ে আসামীকে নিয়ে পড়লো আমার দাদা।

—আপনি হরিচরণ চক্রবর্তীকে খুঁজছিলেন?

বড়দা বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, খুঁজছিলাম। অনেকদিন থেকে।

—হরিবাবুকে দেখে আপনি চিনতে পারেননি?

বড়দা বললে, চিনবো কেমন করে? আমি তো তাকে আগে কোনোদিন চোখেও দেখিনি।

—যখন দেখলেন?

—দেখলাম তিনি কবিরাজ। লেটার-হেডে লেখা রয়েছে কবিরাজ শ্রীহরিচরণ বিদ্যাবিনোদ কাব্যতীর্থ। ভেবেছিলাম, বৈদ্য। তাঁর মেয়ের কাছে জানলাম, তাঁর নাম হরিচরণ চক্রবর্তী। হরিবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম। দেখলাম—তিনি অত্যন্ত চতুর। কিছুতেই ধরা দিতে চান না। বললেন, আমরা চক্রবর্তী নই, চট্টোপাধ্যায়। অনেককিছু জিজ্ঞাসা করলাম। সবকিছু অস্বীকার করলেন তিনি। তখন বাধ্য হয়ে আমাকে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে হলো। তাঁর মেয়েকে বের করে নিয়ে যাচ্ছি বলে তাঁর হাতে ইচ্ছে করেই ধরা দিলাম। নিজে অপরাধী সেজে তাঁকে টেনে নিয়ে এলাম এই আদালতে।

দাদা বললে, ভাল কথা। এবার বলুন—কেন আপনি হরিচরণ চক্রবর্তীকে খুঁজছিলেন?

বড়দা এইবার বলতে আরম্ভ করলে—

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি লোক বি-এ পাস করে কলকাতা শহরে চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কোথাও মনের মত একটি চাকরি সে পেলে না। এদিকে বাড়িতে তার রুগ্না স্ত্রী। ধরতে গেলে একরকম মৃত্যুশয্যায়। অরুণ তার এক বন্ধুর পরামর্শে মোটর চালানো শিখতে লাগলো। ভাবলে, লেখাপড়া শিখে যখন কিছু হলো না, তখন মোটর ড্রাইভারি করেই রোজগার করবে। একা স্ত্রী নয়—ছোট্ট

একটা মেয়েকে নিয়ে আরও বিপদে পড়লো অরুণ। অতি-কষ্টে মোটর চালানো শিখলে, ট্রেনিং স্কুল থেকে পাস করলে, লাইসেন্সও পেলে। এমনি দিনে তার স্ত্রী গেল মরে।

চাকরি একটা পেলে সে। মোটর ড্রাইভারির চাকরি। কিন্তু ছোট মেয়েটাকে কোথায় রাখবে? যেখানে যায়, মেয়েটা থাকে তার সঙ্গে। সে এক বিড়ম্বনা! মনিবের হুকুম। গাড়ি চালাচ্ছে। মেয়েটা খিদের জ্বালায় কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছে তার পাশে। রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে গেল ইলেক্ট্রিক হর্নের আওয়াজে। জেগে উঠেই মেয়েটা কান্না জুড়ে দিলে—বাড়ি যাবে। অনেক করে বোঝালে অরুণ।—'চুপ কর্ মা চুপ কর্, গাড়ি চালাচ্ছি এ-সময় কাঁদলে বাবুরা বকবে। চুপ কর্।' কিন্তু মা-মরা মেয়ে আবদার করে ঝাঁপিয়ে পড়লো গায়ের ওপর—'না আমি বাড়ি যাব।'

'বাড়িতে তোর কে আছে হতভাগী?'—রাগের মাথায় ধমক দিয়ে মেয়েটাকে সরিয়ে দিতে গিয়ে অরুণের হাত গেল কেঁপে। স্টিয়ারিং ঘুরে গিয়ে ধাক্কা মারলে একটা গাছে। বাস্, অরুণের চাকরি সেইদিনেই খতম!

জাপানের সঙ্গে তখন যুদ্ধের তোড়জোড় চলছে সারা দেশে। অরুণ একটা চাকরি পেয়ে গেল। যেতে হবে বর্মার জঙ্গলে। মোটা মাইনের চাকরি। ভাবনা হলো তার মেয়েটার জন্যে। তার এক বড়লোক বন্ধুর কাছে অরুণ গিয়ে বললে, তোমার বিধবা বোনের তো ছেলেপুলে নেই,

তার কাছে আমি আমার মেয়েটাকে রেখে গেলাম। এই-না বলে মেয়েটাকে সেইখানে রেখে অরুণ চলে গেল বর্মায়।

এই পর্যন্ত বলেই বড়দা বললে, এইবার আমার বাসা থেকে পুলিস যে সুটকেসটা এনেছে সেইটে একবার এখানে আনতে হয়।

পেশকারের টেবিলের নীচেই ছিল সে সুটকেসটি। তক্ষুনি তিনি হাত বাড়িয়ে সেটি টেবিলের ওপরে তুলে নিলেন। বললেন, এইখানেই আছে।

পকেট থেকে চাবিটা বের করে দাদার হাতে দিয়ে বড়দা বললে, এই চাবি দিয়ে খুলুন ওটা।

দাদা খুললে।

বড়দা বললে, ওপরে ডালার গায়ে যে খোপটা আছে, ওইখানে একতাড়া চিঠি আছে, বের করুন।

দাদা চিঠিগুলো হাতে নিয়ে একবার উলটেপালটে দেখলে।

বড়দা আবার বলতে লাগলো ঃ

বর্মার জঙ্গলে গিয়ে অরুণ চিঠি লিখলে তার বন্ধুকে— মেয়েটা কেমন আছে জানাও। বন্ধু চিঠির পর চিঠি লিখতে লাগলো— মেয়ে তোমার ভাল আছে।

বড়দা বললে, ওপরের চিঠিগুলো দেখুন। তারিখ হিসেবে সাজানো আছে।

কয়েকখানি চিঠি দেখে দেখে হাকিমের হাতে তুলে দিলে আমার দাদা। বাকী রইলো দু'খানি মাত্র খামের চিঠি।

বড়দা বললে, হঠাৎ অরুণের ভাগ্য গেল খুলে। ড্রাইভারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে জুটে পড়লো একমস্ত বড় ঠিকাদারের সঙ্গে। যে-সব জায়গায় কেউ যেতে চায় না, অরুণ নিজের জীবন বিপন্ন করে সেই জায়গায় গিয়ে ঠিকাদারের কাজ করে দুহাতে টাকা রোজগার করতে লাগলো। সে তখন ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্নে বিভোর। কলকাতায় ফিরে মেয়েটাকে লেখাপড়া শেখাবে। টাকা খরচ করবে মেয়ের জন্যে। তাকে বোর্ডিংএ রাখবে। লেখাপড়া শিখিয়ে তাকে বিলেত পাঠাবে।

বর্মা থেকে আসাম, আসাম থেকে ইম্ফল—ক্যাম্পে ক্যাম্পে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে অরুণ। কারও কথা ভাববার অবসর নেই, মুহূর্তের বিশ্রাম নেই, শুধু কাজ আর কাজ, টাকা আর টাকা! পুরো একটি বৎসর পরে—বর্মা থেকে দু'খানা খামের চিঠি ঘুরতে ঘুরতে অরুণের নামে এসে পৌঁছোলো আসামের এক দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভেতর—তিন নম্বর ঠিকাদারের ক্যাম্পে। কলকাতা থেকে এসেছে তার বন্ধুর চিঠি। মেয়ের খবর পাবে বলে উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রথম চিঠি-খানা খুললে অরুণ।—ওপরের ওই চিঠিখানা পড়ে শুনিয়ে দিন অমরবাবু।

দাদা চিঠিখানি খুলে পড়লে—

ভাই অরুণ,

আজ এক দারুণ দুঃসংবাদ দিচ্ছি তোমাকে। এ সময় বড় একটা কেউ বাড়ির বার হয় না, কিন্তু আমার ভগ্নী অনুরাধা চিরকাল এক জেদী মেয়ে তুমি জানো।

কারও কথা শুনলে না। তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে গেল তোমার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে। হঠাৎ পুরী থেকে এক টেলিগ্রাম পেলাম অনুরাধার কলেরা হয়েছে, আমি যেন অবিলম্বে সেখানে যাই। সঙ্গে সঙ্গে পুরী রওনা হলাম আমার এই অসুস্থ শরীর নিয়ে। আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে অনুরাধা উঠেছিল। গিয়ে আর আমি অনুরাধাকে দেখতে পেলাম না। দেখলাম তার মৃতদেহ। তোমার মেয়েকে আমার আত্মীয়েরা অবশ্য খুব যত্ন করেই রেখেছিল। তারা বলে, অনুরাধা মরবার আগে শুধু একটি কথা বলে গেছে —দাদার সঙ্গে দেখা হল না। দাদাকে বোলো—তার কাছে আমার যে পাঁচ হাজার টাকা আছে, সে টাকা যেন লিলিকে দেয়। লিলিকে নিয়ে অনেক কিছু করবার সাধ ছিল আমার। কিছুই করতে পারলাম না।

তোমার মেয়েকে নিয়ে আমি কলকাতায় ফিরে এসেছি। আমার এক বন্ধু থাকে টালিগঞ্জে। সে একদিন এসেছিল আমার বাড়িতে। তোমার মেয়েটিকে দেখে বলেছিল—আমার স্ত্রীর সন্তানাদি হয়নি। তার একটা ছেলেমেয়ের খুব সাধ। এই মেয়েটিকে পেলে আমি মানুষ করতে পারি।

আমার বাড়িতে কোনও স্ত্রীলোক নেই। কাজেই আমি ভাবছি—তারই কাছে তোমার মেয়েকে রেখে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব। তোমার মত আছে কি না জানিও।

আমার মনের অবস্থা খুব খারাপ। তোমার লিলি ভালই আছে। ইতি— শ্রীঅতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বড়দা বললে, এবার তার পরের চিঠিখানা দেখুন।

দাদা খাম থেকে বের করলে তিনখানি চিঠি। বললে, দু'খানা লিখেছেন শ্রীহরিচরণ চক্রবর্তী, টালিগঞ্জ থেকে।

বড়দা বললে, পড়ুন প্রথম চিঠিখানা।

দাদা পড়লে—

প্রিয় অতুল,

আমার স্ত্রীকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি। শুনিয়া সে অত্যন্ত আনন্দিত হইল। তোমার বন্ধুকন্যা লিলিকে লইয়া তুমি অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছ। সেইজন্য লিখিতেছি, তোমার যদি অমত না থাকে তাহা হইলে আমাকে জানাইবে, আমি একদিন গিয়া লিলিকে লইয়া আসিব।

আশা করি ভাল আছ। ইতি—

শ্রীহরিচরণ চক্রবর্তী।

বড়দা বললে, এইবার পড়ুন দ্বিতীয় চিঠিখানা।

দাদা পড়লে—

প্রিয় অতুল,

তোমার চিঠি পাইয়াছি। লিলির বাবার নিকট হইতে চিঠির জবাব পাও নাই লিখিয়াছ। কিন্তু এই যুদ্ধের হিড়িকে নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া যাহারা বর্মার জঙ্গলে টাকা রোজগার করিতে গিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে সংবাদ পাইবার অপেক্ষায় যদি বসিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে হয়ত সারাজীবনই বসিয়া থাকিতে হইবে। খবরের কাগজে রোজ পড়িতেছি জাপানী বোমারু বিমানের হামলা

চলিতেছে। তিনি জীবন লইয়া যদি কোনোদিন ফিরিয়া আসেন, তাঁহার কন্যা তিনি ফিরিয়া লইবেন।

আমি আগামী রবিবার সকালে গিয়া লিলিকে লইয়া আসিব। তোমার শরীরের যেরকম অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি, ভগবান না করুন, তোমার যদি একটা কিছু হইয়া যায়, তখন লিলির অবস্থা কি হইবে ভাবিতেও কষ্ট হয়।

পুনশ্চ লিখিতেছি, আমি রবিবার যাইতেছি। ইতি—

শ্রীহরিচরণ চক্রবর্তী।

বড়দা বললে, এইবার অতুলবাবুর চিঠিখানি পড়ুন।

প্রিয়বরেষু—

অরুণ, ভগবান যে আমাকে কি রকম বিপদে ফেলেছেন তা একমাত্র আমিই জানি। অনেকদিন যাবৎ তোমার চিঠি-পত্র পাচ্ছি না। অনুরাধার মৃত্যুসংবাদ দিলাম, তোমার কন্যা লিলির একটা ব্যবস্থা করবার কথা জানিয়ে তোমার অনুমতি চাইলাম, তারও কোনও জবাব পেলাম না। এখন ভগবানের নাম স্মরণ করে আমার কর্তব্য আমি করে যাচ্ছি। শ্রীহরিচরণ চক্রবর্তীর চিঠিগুলি এইসঙ্গে পাঠাচ্ছি। গত রবিবার আমি তারই হাতে লিলিকে তুলে দিয়েছি। বাড়িতে একটা মেয়েছেলে না থাকলে ছেলেমেয়ে মানুষ করা যায় না। কাজেই এ-কাজ করতে আমি বাধ্য হলাম। অনুরাধার অন্তিম অনুরোধও আমি রক্ষা করেছি। তার পাঁচ হাজার টাকাও হরিচরণের হাতে দিয়েছি। লিলির নামে সে টাকাটি সে পোস্টাপিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে রেখে

দেবে বলেছে। লোকটি ভাল লোক। আসবে আমি নিজে সঙ্গে গিয়ে হরিচরণের সুগুলি বের নিয়ে তোমার গচ্ছিত কন্যাকে তোমারই হাতে তুলে দেবে। ইভিং-

ইতি—

শ্রীঅতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

চিঠিগুলি হাকিমের হাতে তুলে দিয়ে দাদা বললে, এইবার হরিবাবুর সহির সঙ্গে এই চিঠির সহিগুলো মিলিয়ে দেখা উচিত।

হাকিম হরিবাবুর সহি-করা কাগজখানি তুলে ধরে একটু হাসলেন। বললেন, উনি লিখেছেন হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়।

দাদা জিজ্ঞাসা করলে, ওঁর মেয়ে কি লিখেছে?

হাকিম ললিতার লেখা কাগজখানি তুলে বললেন, হরি-চরণ চক্রবর্তী।

দাদা আবার এসে দাঁড়ালো বড়দার কাছে। বললে, বর্মা থেকে ফিরে এসে অরুণবাবু দেখা করেছিলেন অতুল-বাবুর সঙ্গে?

বড়দা বললে, দেখা করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দেখা পায়নি।

—দেখা না পাবার কারণ?

বড়দা বললে, কারণ তখন তিনি মারা গেছেন।

দাদা এবার জিজ্ঞাসা করলে, আপনার নাম তো বরদা-চরণ, অথচ আপনি গল্প বললেন অরুণবাবুর। এইবার বরদাচরণের গল্পটা বলুন।

চলিতেছে। তি'-'ারবাবু একদিন মদ্যপান করে রীতিমত আসেন, তাঁ'ঃ অবস্থায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার .ম কি ? আসল নাম আমি কাকেও বলতাম না। কারণ আমি তখন লিলিকে কলকাতার জনসমুদ্রে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কে জানে, কার কাছে, কি ভাবে আমার লিলিকে দেখতে পাব ? আমার নাম শুনে যদি সে আত্মগোপন করে ? যদি সে আর আমার মেয়েকে ফিরিয়ে না দেয় ? তাছাড়া ললিতাকে দেখা অবধি আমার কেমন যেন একটা সন্দেহ হয়েছিল। কারণ ওর মুখের সঙ্গে ওর মায়ের মুখের অনেক মিল আছে। তাই বললাম, আমাকে সবাই বড়দা বলে ডাকে, আপনিও আমাকে বড়দা বলে ডাকবেন। হরিবাবু বড়দাকে তক্ষুনি বরদাবাবু করে নিলেন। তারপর পুলিস যেদিন আমাকে গ্রেফতার করলে, সেদিন পুলিসের কাছে আমার নাম বলতে গেলাম, হরিবাবু বললেন, আমি নাম ভাঁড়াচ্ছি। তারপর তিনিই আমার নাম বলে দিলেন। বললেন, লিখুন, বরদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আসামীর কথা পুলিস বিশ্বাসই বা করবেন কেন ? কাজেই এখানেও আমার নাম হলো বরদাচরণ।

দাদা জিজ্ঞাসা করলে, আপনার আসল নামটি তাহলে কি ?

বড়দা বললে, আমার নাম অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দাদা বললে, তার প্রমাণ দিতে পারেন ?

বড়দা বললে, ওই সব চিঠি। সুটকেস থেকে বের করুন ব্যাঙ্কের কাগজপত্র, পাস বই।

হাকিমের হাতে দেবার জন্যে দাদা সেগুলি বের করছিল। বড়দা বললে, ওই সঙ্গে আমার মোটর ড্রাইভিং-এর লাইসেন্সটা বের করুন। তাতে আমার ছবি আছে।

সবগুলি বের করে দাদা হাকিমের হাতে তুলে দিলে।

ফিরে এসে বললে, তাহলে আপনি বলতে চান—ললিতা আপনারই সেই হারানো মেয়ে ?

বড়দা হাকিমের দিকে তাকিয়ে বললে, দয়া করে উনি যদি বিশ্বাস করেন।

ঠিক এমনি সময়ে দোরের বাইরে ভীষণ একটা গোলমাল উঠলো। কিসের গোলমাল দেখবার জন্য পুলিসের লোক যাঁরা ভেতরে ছিলেন তাঁরা ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

পরের দিন রায় দেওয়া হবে বলে হাকিম এজলাস ছেড়ে উঠে যাচ্ছিলেন।

দু'জন কনস্টেবল দুদিকে দুটো হাতে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলো হরিবাবুকে। পেছন পেছন অনেক লোক ঢুকে পড়লো।

একজন কনস্টেবলের হাতে ছিল ভাঙা একটা কাঠের বেঞ্চির মোটা একটা পায়া। সেইটে দেখিয়ে সে বললে, এইটে দিয়ে কিরণশশী দেবীকে উনি মেরে ফেলেছিলেন আর-একটু হলে। এক বাড়ি মেরেছেন। খুব জোর লাগেনি।

হরিবাবু তাঁর হাত দুটো ছাড়াবার জন্যে এক ঝট্‌কা মেরে হুংকার দিয়ে উঠলেন, ছাড়ো! যেতে হয় তো ভাল করেই যাব। দুটোকেই শেষ করে দেবো। আদালতে হাঁড়ির খবর বলতে গেল হতভাগী!

হরিবাবুর নজর এড়িয়ে লোকজনের পাশ কাটিয়ে বড়দাকে নিয়ে দাদা বেরিয়ে যাচ্ছিল, দোরের কাছে পুলিস ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দেখা। দাদা হাসতে হাসতে বললে, কাল 'রায়' বেরুলে হরিবাবুকে হয়ত আবার আপনাদের দরকার হতে পারে। আজকে ছেড়ে দিন।

ইন্সপেক্টর বললেন, ছেড়ে দেবো কি বলছেন অমরবাবু, ললিতাকে ও মেরেই ফেলবে তাহলে।

দাদা বললে, ললিতাকে পাবে কোথায় ? ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি আমার বাড়িতে।

এই বলে দাদা বেরিয়ে গেল। আমি গেলাম তাদের পিছু পিছু।

বাইরে বারান্দার একটি বেঞ্চির ওপর বসে ছিল ললিতা আর কিরণশশী।

কিরণশশী কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, ও ডাকাতটার বাড়িতে তুই যাসনি মা, চল আমার সঙ্গে। আমি তোকে নিয়ে যাই।

—কে কাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ?

বলতে বলতে দাদা গিয়ে দাঁড়ালো বড়দাকে সঙ্গে নিয়ে।

কিরণশশী বললে, এই যে বাবা, ললিতার কথা বলছিলাম।

দাদা ডাকলে, ললিতা !

ললিতা উঠে দাঁড়ালো।

বড়দা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। দাদা তাকে দেখিয়ে বললে, তোমার বাবাকে প্রণাম কর। এই তোমার বাবা।

ড়দার দিকে সলজ্জ চোখ দুটি তুলে বললে, এ-চিঠি আপনি নিয়েছিলেন তাহলে ?

বড়দা বললে, হ্যাঁ মা, আমিই চুরি করেছিলাম। সমর, ললিতাকেও নিয়ে যাও তোমার সঙ্গে। দু'জনে গিয়েই গাড়ি ডেকে আনো।

ললিতাকে আমার দিকে ঠেলে দিলে তার বাবা।

লজ্জায় ললিতা আসতে পারছিল না।

আমিই হাত বাড়িয়ে তার একখানা হাত ধরে বললাম, এসো।

ললিতা আমার সঙ্গে যেতে যেতে বলল, তুমি সব জেনেও আমাকে সেই আগের মত ভালবাসতে পারবে ?

আমি বলি, তবে কেন এ কদিন ধরে মামলা দেখতে এলাম ? তুমি কি বোঝ না ললিতা যে, কেবল তোমাকে দেখার জন্যে আমি রোজ এখানে আসতাম ?

ললিতা তবুও ভীরু লজ্জাবতী লতার মত হয়ে গিয়ে বলে, তোমার দাদা-বৌদি কি আমাদের এ বিয়েতে মত দেবেন ?

আমি বলি, মত দেবেন মানে ? দিয়েছেন। তাছাড়া তুমি আমার দাদাকে জান না। তিনি ভিন্ন প্রকৃতির লোক। তোমার চিঠি পড়ে মনে হয় তিনি সবই জানতে পেরেছেন।

* * *

বেশী খোঁজাখুঁজি করতে হল না। কাছেই একখানা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। দাদাকে গিয়ে খবর দিতেই

কিরণশশী দেবীকে আর বড়দাকে সঙ্গে নিয়ে দাদা উ
পড়ল সেই ট্যাক্সিতে। তার পর ড্রাইভারকে বলল, সো
চল শ্যামবাজার।

গাড়ি চলতে শুরু করল। কারো মুখেই কোন কথা
নেই। নীরবতা ভেঙে প্রথম কথা বলল আমার দাদা।

—অরুণবাবু! মেয়ের বিয়ে দেবেন তো?

বড়দা বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। তা তো দিতেই হবে।

—তাহলে আমার এই অপোগণ্ড ভাইটার সঙ্গে দিতে
রাজী আছেন?

বড়দা বলে, কার সঙ্গে? সমরের সঙ্গে? এ তো
আমার পরম সৌভাগ্য।

দাদা বলে, সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তা জানি না মশাই।
তবে উনি আবার ললিতাকে……। তাহলে ওই কথাই
রইল। আগামী বৈশাখের প্রথম লগ্নেই ওদের বিয়ে হবে।

কিরণশশী দেবী বলে, হ্যাঁ বাবা! আমার ললিত
কার সঙ্গে বিয়ে হবে? তাকে একবার চোখে দেখতে পা
না?

দাদা বলে, দেখতে পাবেন বইকি মা! সে তো ওই
আপনার সামনেই ড্রাইভারের পাশে বসে রয়েছে।

কথা শেষ করে দাদা আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে
তখন লজ্জায় মুখচোখ আমার লাল হয়ে উঠেছে। ইচ্ছ
করছিল যেন চলন্ত ট্যাক্সি থেকেই নেমে পড়ি। কিন্তু
তখন তার আর উপায় ছিল না।

সমাপ্ত